নিজেকে চিনতে বই পড়ি
আলোকিত মানুষ গড়ি
DR.AMIN LIBRARY
Dr. Amin Library
www.facebook/draminlibrary

মোহ-ভঙ্গ

মোহ-ভঙ্গ

MOHA-BHANGA
by
Bajlur Rahman
Rs. 3·50

প্রকাশক ও পরিবেশক ঃ
কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল।
প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৬৯।

ব্লক ঃ লিঙ্ক আর্ট, ঢাকা।
প্রচ্ছদ ঃ বি, সাহা।
বাঁধাই ঃ
মোঃ জয়নাল আবেদীন
মুদ্রাকর ঃ
মোঃ এ, রহিম
কালার আর্ট প্রেস, বরিশাল।

মূল্য — ৩·৫০

মোহ-ভঙ্গ

বজলুর রহমান

কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল।

ভূমিকা

গ্রাম-বাংলায় ছড়িয়ে রয়েছে দেশের অগণিত শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বাস। গ্রাম্য চাষী-সাধারণ, ভুঁই-ক্ষেত আর গরু-বাছুর নিয়ে যাদের নিত্য-নৈমিত্যিক কারবার—আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে তাদের প্রকাশ খুব কমই দেখা যায়। অথচ, দেশের একটি প্রধান অংশই হচ্ছে গ্রাম-বাংলার এই সব চাষীবৃন্দ।

অশিক্ষিত গ্রাম্য পরিবেশে বিভাগ-পূর্বকালীন আদি সমাজ-ব্যবস্থা, চাল-চলন ও রীতি-নীতির প্রকাশ ঘটেছে "মোহ-ভঙ্গ" উপন্যাসে। সাহিত্য-জগতে অবহেলিত এই সব গ্রাম্য অশিক্ষিত সমাজ জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে সাধ্যাতীত নিপুণতার সঙ্গে। গ্রাম্য অশিক্ষিতের মধ্যেও ক্রমে সামাজিক অনাচার, অন্যায় দূরীভূত হয়ে যায়—এগিয়ে চলে সবাই সোনালী রঙিন দিনের আশায়, মেতে ওঠে স্বাধীনতা সংগ্রামে; গ্রামবাসীর দীর্ঘ তমসাচ্ছন্ন মোহ যায় ভেঙে।

মোহ যখন ভাঙ্গে—তখন সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাসিল হয় দেশের আজাদী। নতুনভাবে এ-দেশ গড়ার জন্য এগিয়ে আসে সবে দৃপ্ত শপথ নিয়ে·········।

এমনি পটভূমিকায় আমার এ প্রয়াস "মোহ-ভঙ্গ" তুলে ধরলাম পাঠক সমাজের সামনে। বাস্তব সমাজ জীবনের ছবি এতে অঙ্কিত হয়েছে কি-না—তারাই বিচার করবেন।

বিনীত—লেখক।

॥ ১ ॥

জ্যৈষ্ঠের দুপুর।

আকাশে একফোঁটা মেঘ নেই। প্রচণ্ড সূর্য-রশ্মিতে বসুধা তেঁতে পুড়ে যেন তামার আকার ধারণ করেছে। মাঠঘাট নিজের বুকে দাবানল জ্বেলে দিয়ে সৃষ্টি ধ্বংসের উল্লাসে মেতেছে। তার বুকে আগুনের লেলিহান শিখা লিক্ লিক্ করে উঠানামা করছে। যেন উপরের নীল আকাশটি পুড়িয়ে ছারখার করবার জন্যে তার লিক্‌লিকে্ জিহ্বা বাড়িয়ে দিচ্ছে। চারদিকে আগুন আর আগুন। প্রকৃতি নাজেহাল। মাঠ-ঘাট জন-প্রাণীশূন্য। হয়তো কোন্ ঝাড়ার মধ্যে কিংবা কোন গাছতলায় যে দু'একটা গরু-বাছুর বাঁধা আছে, তারা জিভ বের করে হঁাফাচ্ছে আর নাক-মুখ দিয়ে চীৎকার ধ্বনি নিক্ষেপ করে প্রকৃতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুল্‌ছে।

জমিতে ধান-পাট বোনা শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বারের মত বিঁদে বাযুই দেওয়াও শেষ। প্রচণ্ড তাপে ধান, পাট ঝিমিয়ে রয়েছে। তাতে যেন প্রাণ নেই। শুক্‌নো ঘাসের মত ধানের পাতা কুঁক্‌ড়ে গেছে। এমন তাতেও চাষীদের মাঠে না বেরুলে উপায় নেই। কেননা, বিঁদের এড়ানো ঘাসগুলো এখন তুলে না দিলে, একবার পানি পেলে তারা বেড়ে যাবে; ধান পাটের ক্ষতি হবে। তাই চাষীরা জমিগুলো নিড়িয়ে ছাপ করে দিচ্ছে। সারাদিন সেই প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ডুব মেরে জমি নিড়িয়ে ভর-দুপুরে সব

বাড়ী যায়। পরিশ্রম খুব বেশী হয়, তবু নিজেরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে না। কেন না, এই ফসলের মধ্যেই তাদের আগামী দিনের রঙিন স্বপ্ন-গাঁথা।

এমনি কাঠফাটা রোদে ঘেমে নেয়ে—দুর্বল শরীরটাকে কোন রকম টেনে হেঁচড়ে নিয়ামত দামড়া গরু দু'টো খেঁদিয়ে নিয়ে বাড়ী এলো। উঠানের সামনে ড্যাফল গাছটার তলায় গরু দু'টো বেঁধে রাখলো। তারপর হুকোটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে মাথার টোকাটা আর বগলে ধরা নিড়ানীটা হাতনের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে ধপাস্‌ করে পটের মধ্যে বসে পড়লো।

স্ত্রী সখিনা তখন রান্না ঘরে তরকারীর কড়াইতে বাটনা দিচ্ছিল। স্বামীর বাড়ী আসবার সাড়া পেয়ে আঁকার মধ্যে জ্বালানীটা ঠেলে দিয়ে ছুটে রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দেওয়ালের গায় হেলান দেওয়া হুকোটা তুলে নিল। হুকোর মধ্যে যে পানি ছিল, তা' ফেলে দিয়ে ভাল করে ধুয়ে আবার পানি ভরলো। স্বামীর কোমরে গোঁজা তামাকের ন্যাক্‌ড়াটা নিয়ে কলকেয় তামাক পুরলো। রান্না ঘর থেকে আগুন দিয়ে কলকেটা হুকোর মাথায় লাগিয়ে স্বামীর হাতে দিল। নিয়ামত স্ত্রীর হাত থেকে হুকোটা নিয়ে পটের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ দু'টো বুঁজে পরম তৃপ্তির সাথে ধূম পান করতে লাগলো। সখিনা ভাঙ্গা ঝন্‌ঝনে তালপাখাটা হাতে নিয়ে স্বামীকে বাতাস করতে বস্‌লো। নিয়ামত কিছুক্ষণের জন্যে যেন দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা—তার সংসারের চিন্তা, রৌদ্রদগ্ধ মাঠের ফসলের কথা, নিজের কঠোর পরিশ্রমী দেহের জ্বালা যন্ত্রণার কথা—শেষে সংসারের অভাব অনটনের কথা সব ভুলে গেল।

এক সময় স্ত্রী স্বামীর মাথায় একটা ঝাকি দিয়ে বললো—আর কতক্ষণ বসে বসে ঝিমুবে, ন্যাও—এবার উঠে নেয়ে খেয়ে জিরোও। সখিনা রান্নাঘর, থেকে পলাশুদ্ধ তেলের ভাড়টি নিয়ে এলো। নিয়ামত পলাটা তুলে একবার হাতের তালুতে, একবার চেটোয় ঘষে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সেলায়ের উপর সেলাই দেওয়া ময়লা তেলচিটে গামছাটা কাঁধে ফেলে বাড়ীর পাশে সর্দারদের পুকুরে গেল স্নান করতে। পুকুর তো নয়, যেন ডোবা। আবার তাতে যে পানি আছে, তার মধ্যে কাঁদাই বেশী। এর চেয়ে নিয়ামতের নিজের ঘরের পিছনের কুয়োটি আরও ভাল। তাতে অনেক পানি আছে। কিন্তু

দোষের মধ্যে সেটা কচুরীপানায় ভরে গেছে। তার মধ্যে লতা-পাতায় ছেয়ে গেছে। যত রাজ্যের মশা তার মধ্যে রাত দিন রাগ-রাগিনী গেয়ে চলেছে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। তার মধ্যে যদি একটু ফাঁক থাকতো, তা' হলে নিয়ামত কি পাঁচটা মন্দ কথা শুনে সর্দারদের পুকুর নামের ডোবার একহাটু পানির মধ্যে ডুব দিতে আসতো!

সে কতবার মনে করেছে, কালকে ঠিক, তার পিছনের কুয়ো খানিকটা পরিষ্কার করবে। কিন্তু তার সেই কাল আর আসে না। একেবারে আপন ভোলা সাদাসিদে মানুষ। কোন রকম জেদ্ তার মধ্যে নেই। জেদ যদি থাকতো, তা'হলে এতোদিনে কবে তার পেছনের কুয়ো পরিষ্কার হয়ে যেত।

নিয়ামত একহাটু পানির মধ্যে নেমে পিঠের ভাড়াটা দুম্‌ড়ে টান্‌টান্ করে পানিতে দুটো ডুব দিল। পানির শব্দ শুনে বাড়ীর মধ্য থেকে বড় সর্দার হাঁক দিল—এই ভর দুপুরে পুকুরের মধ্যে কে রে?

সর্দার সামনে নেই। তবু নিয়ামত মাথাটা নীচু করে একবার কাঁপা গলায় বলে—আমি, চাচা!

—কে, নিম্‌তে?

—হ্যাঁ গো।

—তা' এতো রোদে পানি ঘোলাচ্ছিস ক্যান, মাছগুলো মরে যাবে না? রোজ রোজ বারণ করি, তা' শুনতে পাসনে হতচ্ছাড়া?

—না চাচা, পানি ঘোলাচ্ছিনে, একেবারে কোলাচে চ্যান করছি।

—তা কোলাচে তুই নামবি ক্যান? জানিসনে, পাড়ার সবাইকে বারণ করে দিয়েছি। খবরদার! আর আসিস্‌নে।

—তা' তোমার পুকুরে আসতে না দিলে, ক'নে যাব চাচা! পানি কি আর কোথাও আছে? সব শুকিয়ে গেছে না! থাকবার মধ্যে শুধু তোমাদের এই পুকুরে আছে। তাও আবার যদি না আসতে দাও, তা'হলে আমরা গরীব মানুষ, ক'নে যাব চাচা!

ক'নে যাতি—আমি কি করে বলবো রে ব্যাটা। যেনে পারিস, সেখেনে যেয়ে মরগে। গরমে মানুষ তিষ্টিতে পারছে না, একদণ্ড চুপ করে বসে

থাকবো, তা' হবার উপায় নেই। এ-সব নবাব পুত্তুরদের সাথে অহরাত্র বকলে হয় না! তা' তোর অতো কথা হলো কবেরে নচ্ছার?

নিয়ামত আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাল মন্দ শুনতে চাইলো না। হাটুর নীচের ভিজে লুঙ্গিটা একটু উপরে টেনে দু'হাতের মুঠোর মধ্যে একটা চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে গেল। সর্দার তখন ওদিকে ঘরের হাত-নেয় বসে পাড়ার যারা তার পুকুরে স্নান করতে এসে পানি ঘোলায়, তাদের উদ্দেশ্যে অবিরাম বকে চলেছে।

নিয়ামত বাড়ী যেয়ে হাতনের নীচে দাঁড়াতেই সখিনা শুকনো লুঙ্গিখানা স্বামীর হাতে ফেলে দিল। ভিজে কাপড় ছেড়ে নিয়ামত হাতনের উপর উঠে বিছানার উপর যেয়ে বসলো। সখিনা ততক্ষণে স্বামীর ভাত-তরকারী নিয়ে এসেছে। নিয়ামত খেতে বসলো। খেতে খেতে একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আবার মাথা নীচু করলো। অমনিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। সখিনা স্বামীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে শাসনের সুরে বললো—ঐ দেখ, খেতে বসেও আবার চিন্তা। সারাদিন রোদে পুড়ে কাঠ হয়ে বাড়ী এসে দু'টো মুখে দিয়ে একটু জিরিয়ে নেবে—না, কেবল চিন্তা আর চিন্তা। এতো কি চিন্তা কর, বলতো?

নিয়ামত আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললো—তোমাকে এবার ভাল কাপড়-চোপড় দিতে পারলাম না; যে গয়নাগুলো ছিল, তাও আবার বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে এলাম। আশা ছিল, এবার আবাদ ফসল ভাল হবে; তাই বেঁচে কিনে তোমাকে আবার নতুন করে সাজাবো। কিন্তু পোড়া কপাল! তা' কি হলো? আকাশে এক ফোঁটা পানি নেই। ধান-পাট সব মরতে বসেছে। যদি পানি না হয়—তা'হলে উপায় কি!

—তোমার কেবল উপায় আর উপায়। বলি রাজ্যির লোকের আর কারও চিন্তা আছে, না কেবল তোমারই আছে? সবার যা' হয়, আমাদেরও তাই হবে। তার জন্যে চিন্তা করে কোন লাভ আছে? খালি খালি মন খারাপ করা। পানি যদি না-ই হয়, তার জন্যে তোমার আমার কিছু করার আছে নাকি! খোদার ইচ্ছা যখন হবে, তখন হবে; তুমি আমি ভেবে ম'লেও পানি হবে না।

নিয়ামত মাথা তুলে একটা ঢোক গিলে বললো—তুমি তো বলছো ছুকু, কিন্তু আমার যেন মন কেমন খারাপ লাগছে। বাপ মা তোমাকে গা ভরা গায়না দিয়ে গেল, আর আমি হতভাগা খ্যায়কুড়ে—সব খ্যায় করে ফেললাম। আবার যে দিতে পারবো—সে ভরসা নেই।

—না থাকলেও বা। তুমি অতো শতো ভেবো না, চুপটি করে খেয়ে নাও। তোমায় অতো চিন্তা করতে দেখলে আমার মনে ব্যথা লাগে।

নিয়ামত প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে বললো—আজকে লাউ তরকারী কিন্তু খুব ভাল লাগছে।

—ভাল না ছাই লাগছে। কি-ই বা এমন দিয়েছি ওতে, কোন মসলা-পাতি তো দেইনি; একটু জিরের গুড়ো—তাও দিতে পারিনি।

—সত্যি বলছি, ভাল লাগছে।

—লাগুক, আর বকো না. তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। একটু জিরুতে হবে না! আবার এখনই তো মাঠে চলে যাবা।

নিয়ামত আর কথা বাড়ায় না। হাত-মুখ ধুয়ে উঠে পড়ে। সখিনা একটি বালিশ এনে দেয়। সে বালিশটা টেনে নিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে। সখিনা আবার হুকোটা সেজে এনে দেয়। নিয়ামত হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে হুকোর মুখে মুখ লাগিয়ে টানতে থাকে। এক সময় হুকোটা সরিয়ে রেখে চিত হয়ে শুয়ে চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করে।

সখিনা থালা বাটির এঁটো পরিষ্কার করে রান্নাঘরে নিয়ে যায়। দুটো মুখে দিয়ে রান্নাঘরের কাজ সেরে ঘরে চলে আসে। স্বামীর বিছানায় বসে পাখার বাতাস করতে করতে এক সময় সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম তো নয়, কেবল চোখের পাতা বোঁজা। এতো গরমে কি ঘুম হয়! বাতাস করতে করতে ঘুমিয়েছিল, সে মাত্র এক ছটাক ঘুম। গরম লেগে ঘেমে যেন সিদ্ধ হয়ে আবার জেগে উঠলো। স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখলো ঘেমে দর্ দর্ করে সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। নিজের গায়ের কাপড় সংযত করে নিয়ে স্বামীকে বাতাস করতে লাগলো।

নিত্য অভ্যেস মত নিয়ামত এক ঘুম দিয়ে জেগে উঠলো। সখিনা তাড়াতাড়ি এক বদনা পানি এনে দিল। পাড়া-গাঁ। ঘরের চারদিকে বাগান। সামনে বাঁশ বাগান, পিছনে কলাবাগান। শহরের মত এখানে কারও বাড়ীতে পাকা কিংবা কাঁচা পায়খানা ঘর নেই। বাগানের আড়ালে খোলা যায়গায় বসে গেঁয়ো লোকদের পায়খানা প্রস্রাব করবার অভ্যাস। নিয়ামত বদনা নিয়ে বাড়ীর সামনে চলে গেল। কাজ সেরে বাড়ী এসে হাতে মুখে পানি দিয়ে টোকাটা মাথায় দিল। নিড়ুনটা বগলের তলে গুজে হুকো টানতে টানতে দামড়া গরু দু'টো খেদিয়ে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল।

॥ ২ ॥

সখিনা স্বামীর গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাতনের উঠে কাঁথা নিয়ে সিলাই করতে বস্‌লো। সুঁই দিয়ে কাঁথায় ফোঁড় দেয়, আর মনে মনে নিজেদের কথা ভাবে। তার স্বামীর এই অচলাবস্থার জন্যে সে নিজেকে দোষী করে। তার স্বামীর কি ছিল না! সবই তো ছিল। বাপ-মা ভাই-বোন। গোলায় ধান, গোয়ালে ভাল ভাল গরু। বিয়ের দু'বছর পরে শ্বশুর বেহেশতবাসী হলেন! উঃ! শ্বশুরের কথা মনে উঠলে দুঃখে তার অন্তর ফেটে বেরিয়ে যেতে চায়। কেমন মহৎ তার শ্বশুর ছিলেন! যেদিন সে এ-বাড়ীতে এলো, সেদিন গরুর গাড়ী থেকে নামতেই শ্বশুরের যে কি আমোদ! তিনি নিজেই ছুটে এসে আর কাউকে নিতে দিলেন না! নিজেই তাকে কোলে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। তাই নিয়ে শাশুরীর যে কি অভিমান! শাশুড়ী মনে করেছিলেন, তিনি নিজে তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে ঘরে তুলবেন। তাঁর আগেও শ্বশুর যেন একপ্রকার ছো মেরেই তাকে কোলে তুলে নিলেন। আনন্দে যেন ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে তাকে ঘরের দিকে নিয়ে চললেন। শাশুড়ী চীৎকার করে উঠলেন—আহ্! কর কি! তুমি কি পাগল হলে নাকি! লোকে বলবে কি!

শ্বশুর কি সে কথায় কান দিলেন! তাকে নিয়েই ঘরের দিকে গেলেন।

শাশুড়ী ক্ষেপে যেয়ে দৌঁড়ে এসে শ্বশুরের হাত ধরে ফেললেন—আরে দাঁড়াও না ছাই, একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেই। অমন করে শুধু মুখে তুলতে নেই।

শ্বশুর আর কী করেন! বৌকে নিয়ে দাঁড়ালেন। শাশুরী চিনির পানির গ্লাস তার মুখের সামনে তুলে ধরলেন। সখিনার আজ মনে পড়ে—সে কি লজ্জা। লজ্জায় সে খেতে পারে না।

শাশুড়ী খোসামোদ করেন। খাও, লক্ষীটি! এটুকু খেয়ে ফেলো।

সরবত সে খেয়েছিল। কিন্তু খেতে যেয়ে কি লজ্জায় তাকে ধরেছিল, সে কথা মনে উঠলে আজ তার হাসি লাগে।

শ্বশুরের সে কি আদর-যত্ন! তিনি এদিক ওদিক যেতেন—বাড়ী এসেই চীৎকার করে ছোট ছেলেটির মত ডাকতেন--মা—ও ছোট মা!

শাশুড়ী ধমক দিতেন—তুমি কি রকম লোক গো! অমন করে হাঁক-ডাক দিয়ে পাড়া মাথায় কর কেন! ওদিক-ওদিক থেকে আসবে—ছোট মা! কেন, অতো ডাকাডাকি কেন? তোমার একার তো মা নয়, আমারও তো মা!

শ্বশুর হাসতে হাসতে বলেন—বড় বৌমা, মেজ বৌমাকে দিয়ে তো আচ্ছা করে সুখ মিটিয়েছো, আমি না হয় ছোট বৌমাকে দিয়েই সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে নিই।

সখিনার আজ স্পষ্ট মনে পড়ে—তাকে নিয়ে তার শ্বশুর-শাশুড়ীর সে কি মান-অভিমান! এ কথা মনে উঠলে তার ভারী লজ্জা লাগে। সময় সময় দুঃখে তার অন্তর ফেটে বেরিয়ে যেতে চায়। বাড়ীতে ভাল তরকারী রান্না হলে শ্বশুর বলেন—ছোট বৌমাকে একটু বেশী করে দিও। বড় মাছ আনলে বলেন—মুড়োটা ছোট মাকে দিও। মাংস রান্না হলে বলেন দিল্ কল্‌জে ছোটমাকে দিতে ভুলো না যেন। শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে থাকতে তাকে কোন দিন সংসারের কাজ করতে হয়নি। কিছু করতে গেলে শাশুড়ী বলতেন— আমি মরে গেলে কাজ করো মা! আর ক'দিনই বা বাঁচবো! যে ক'দিন বাঁচি, সে ক'দিন এই সামান্য কাজ খুব করতে পারবো। তারপর তোমাদের সংসার— যখন যা' খুশী, তাই করো।

আজ সখিনার একটা কথা মনে পড়লে বড় ব্যথা লাগে। শ্বশুরের যে কি প্রতীক্ষা! ছোট বৌমার ছেলে-মেয়ে হবে, নাতি-পুতি নিয়ে তিনি খেলা করবেন! কত রাজ-রাজ্যির গল্প করবেন। কত আশা আকাঙ্খা তিনি করতেন! ঠাট্টা করে বলতেন—বৌমা, মেয়ে হলে কিন্তু আমাকে দিতে হবে; তোমার মেয়ে নেবো বলে আজও বেঁচে আছি। শাশুড়ী বলেন—মেয়ে হবে কেন গো— বৌমার একটা সোনার চাঁদের মত ছেলে হোক। তুমি বুড়ো হয়ে গেছো, তোমাকে দিয়ে আজ আর কোন কাজ হবে না। বৌমার ছেলে হোক, আমার কাজে লাগবে।

শ্বশুর হো-হো করে হেসে উঠেন। বলেন—আমাকে বাদ দেওয়ার মতলব করছো নাকি! আমি বুঝি একা বুড়ো হয়ে গেছি, না? তুমি বুড়ী হওনি? নিজেকে এখনও যুবতী বৌ ঠাওরেছো নাকি!

শাশুড়ী ধমক দেন—তুমি কি রকম বেয়াক্কেলে লোক গো! বৌমার সামনে তোমার এসব কি কথা! বুড়ো হয়ে গেছো, তা' একেবারে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে ফেলেছো না কি! যাও, মাঠের দিকে ছেলের কি করছে—দেখো গে, বাড়ীতে কুলো ব্যাঙটির মত বসে আর বকর্ বকর্ করতে হবে না।

শ্বশুরও বলতে ছাড়েন না—বলি তোমারও কি কাজ করবার কিছু নেই? তুমিই বা আবার আমার কাছে এসে বক্‌ছো কেন?

—কও কথা, বলি আমি কি মাঠে যেয়ে মিনষেদের মত ভুঁই নিড়ুবো নাকি!

এমনি কত কথা কাটাকাটি করতেন তার শ্বশুর-শাশুড়ী।

তারপর একদিন কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, সখিনা কিছুই বুঝতে পারলো না। মাত্র দু'দিনের জ্বরে তার মেঝ ভাসুরটি মারা গেলেন। ওহ্, কি শোক্! কি দুঃখ, কি কান্নাকাটি সেদিন এ-বাড়ীতে! শ্বশুর-শাশুরী যেন পাগলের মত হয়ে গেলেন। যোয়ান ছেলে ঘরে, সোনার প্রতিমা বৌ, কোলে চাঁদের মত মেয়ে। সেদিন বাড়ী শুদ্ধ লোকের সে কি আকুল কান্না! সে কথা মনে উঠ্‌লে সখিনার আজও বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসে। ছেলেকে কবরে শুইয়ে রেখে সেই যে শ্বশুর বিছানায় কাৎ হলেন, আর উঠলেন না। পাঁচমাস বিছানায় থাকলেন। একটু চুপ করে থাকেন আর ডাকেন—ছোটমা! শ্বশুরের ডাকে সে দৌড়ে যেত। বলতেন—মেঝ বৌমাকে ডেকে নিয়ে এস।

সখিনা তার মেঝ জা'য়ের হাত ধরে যখন তার শ্বশুরের কাছে নিয়ে যেত, তখন তাঁর সে কি কান্না! বুড়ো মানুষ। ছেলের শোকে একেবারে তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে। তাঁর জীর্ণ শীর্ণ হাত বের করে মেঝ বৌকে কাছে ডেকে বসাতেন। তারপর যে কি ছেলে মানুষের মত কান্না! মেঝ বৌও ডুক্‌রে কেঁদে উঠতো। কতবার মেঝ বৌর বাবা নিতে এসেছেন, কিন্তু সে যেতে চায়নি। সে তার বাপজানকে বলে দিয়েছে—আমার জন্য তোমরা কোন চিন্তা কর না। আমি বেশ আছি। তাই শ্বশুর তাকে বোঝাতেন—তুমি অবুঝ হ'য়ো না, বৌমা! এখনও কচি বয়স।

কেন জীবনটা নষ্ট করবে, মা! যা হয়ে গেছে, তার জন্যে আর চিন্তা করে কোন লাভ নেই।

মেঝ বৌ শ্বশুরের কথা শুনে ডুকরে কেঁদে ফেলতো। বলতো—আমি কি আপনাদের সংসারের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছি জামাই?

শ্বশুর দাঁতে জিভ কেটে বলেন—অমন কথা তুমি বল না বৌমা! কিসের বোঝা তুমি! তবে বলছিলাম কি, খোদা বাঁচান তো, তোমার এখনও আস্তকাল পড়ে আছে। জীবনটা তো অস্বীকার করা যায় না। তাই এ কথা বল্‌ছি।

—আমার সুখ-দুঃখের কথা মনে করেই তো বলছেন, সে আমি বুঝতে পেরেছি। তবে কথা হচ্ছে কি, সুখ যদি আমার ভাগ্যে থাকতো, তা' হলে এখানেই হতো। নেই যখন, তখন কোথাও গেলে হবে না। আর আমি কি করেই-বা যাই। তাজা রক্তে গড়া আমার পেটের সোনামণিকে কি করে অস্বীকার করতে পারি?

শ্বশুর আর কথা বলতে পারলেন না! বালিশে মুখ গুজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। চাঁপা কান্নায় তিনি ভেঙ্গে পড়লেন। সেই যে শ্বশুরের মুখের কথা ফুরিয়ে গেল, আর কথা বেরুলো না। দীর্ঘ পাঁচমাস পর তিনি ইহজগৎ ছেড়ে গেলেন। তাঁর মরবার সময় সখিনার স্বামী বাড়ীতে ছিল না। কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল। বাপের মৃত্যু সংবাদ আত্মীয়ের বাড়ীতেই পায়। সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে বাড়ীতে। তারপর মৃত বাপের বিছানার উপর দড়াস্‌ করে পড়ে যেয়ে সে কি কান্না! পাড়া-প্রতিবেশীরা সকলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কান্না বন্ধ করতে পেরেছিল। কিন্তু নিয়ামতকে কেউ নিরস্ত্র করতে পারেনি। বাপের শোকে নিয়ামত কতদিন যেন আড়ালে আবডালে কেঁদে-কেটে বেড়িয়েছে। আর তার শাশুরী স্বামীর মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে সেই যে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না। দু'মাস পরে তিনি সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে স্বামীর কাছে চলে গেলেন। বাপের মৃত্যু শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আবার মায়ের শোকে নিয়ামত যেন একেবারে পাগলের মত হয়ে গেল। মায়ের মৃত্যু শোক কাটিয়ে উঠতে তার কয়েক মাস লেগে যায়।

সখিনার চিন্তার মধ্যে হঠাৎ ছেদ পড়ে। তার বড় জা' ডেকে বলেন—ও ছোট বৌ, বলি রাত পর্যন্ত কাঁথা সেলাই করবি নাকি? পানি-টানি তুলবিনে?

সখিনা একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে—বেলা অনেকখানি পড়ে গেছে। তাই তো! তার যে এখন অনেক কাজ করতে হবে। কলের পানি, পুকুরের পানি আনা, জ্বালানী গোছানো; আবার সকাল সকাল দু'টো রান্‌তে হবে তো!

সখিনা কাঁথাটা ভাঁজ করে ঘরের আড়ায় তুলে রাখে। বিছানাটা তুলে বার দুই ঝেড়ে ভাঁজ করে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে রাখে। ঝাড়ু দিয়ে ঘরে একটু পানি ছিটিয়ে বাইরে চলে যায়।

বেলা ডুবুডুবু ভাব হলে নিয়ামত দামড়া গরু দু'টো নিয়ে বাড়ী আসে। সখিনা চাল ধোয়া পানি আর ফ্যানের পানি রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসে গরুর নারায় ঢেলে দেয়।

নিয়ামত গরু দু'টো গোয়ালে বেঁধে বিচালী কাটতে বসে। সখিনা এর মধ্যে তামাক সেজে এনে দেয়। নিয়ামত বাটির উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে তামাক টানে। কলকের তামাক পোড়া শেষ হয়ে গেলে হুকোটা এক পাশে সরিয়ে রেখে বিচালী কাটতে থাকে। আকালের বছর, তাই বিচালীও বেশী কাটতে পারে না। বেশী তো নেই, আবার অঘ্রাণ মাস পর্যন্ত খাওয়াতে হবে। তাই দু'টো গরুর জন্যে মাত্র দু' ঝুড়ি কেটে দেয়। না কাটলেও হয় না, মাঠে কোথাও ঘাস নেই। যা' আছে, তা' রোদে শুকিয়ে কুঁকড়িয়ে গেছে। গরুরও তো প্রাণ আছে—বোবা জন্তু, তাই কিছু বলতে পারে না। তাই শুধু-মুখে রাখা যায় না।

সন্ধ্যাবেলা আবার চ্যান না করলে হয় না। সারাদিন মাঠে রোদে পুড়ে ঘেমে গা-গতর সব গন্ধ হয়ে গেছে। নিয়ামত আর সর্দারের পুকুরে যায় না। গেলে আবার হয়তো বুড়ো সর্দারের সারারাত ঘুমই হবে না। সারারাত বক্‌বক্ করেই কাটিয়ে দেবে। নিয়ামত মিয়া সাহেবদের পুকুর থেকে ঝুপ্‌ঝাপ করে দু'চারটা ডুব দিয়ে আসে। সখিনার রান্না-বান্না শেষ হয়ে গেছে। স্বামী বাড়ীতে এলে শুকনো কাপড় এগিয়ে দিয়ে, বাইরের উঠোনটা বেশ কিছুটা

ঝাট, দিয়ে খেজুর পাতায় বোনা বেঁধে পাটিটা বিছিয়ে দিল। সখিনার জানা আছে—আবার এখনই পাড়ার দু'চারজন মানুষ আসবে তাদের বাড়ীতে। পূবের পাড়ার রিজিয়ার বাপ, উত্তর পাড়ার সালেহার বাপ, আর কুলসুমের বাপ, পশ্চিম পাড়ার রসিদের বাপ, হাসির বাপ আর কতলোক জানি তাদের উঠোনে রোজ রাতে এসে জমা হয়। কেউ তাস খেলতে বসে, যারা তাস খেলতে জানে না, তারা কলকের পর কলকে তামাক ধ্বংস করে আর সুখ-দুঃখের গল্প করে রাত ভারী করে।

সখিনার এখনও ছেলেমেয়ে হয়নি। তাই বলে তাদের বাড়ীতে কোন অশান্তি নেই। পাড়ার ছেলেমেয়ে, লোকজন—সময় নেই, অসময় নেই, আসতেই আছে। নিয়ামত খুব বেশী একটা হাসতে জানে না; তবে লোক হাসাতে পারে খুব। বিশেষ করে ছেলে-মেয়েদের সাথে মজার মজার আজগুবি গল্প বলে তাদের হাসিয়ে লুটোপুটি খাইয়ে আবার অবাক বানিয়ে ছাড়তে পারে। তাই অনেকের মুখে প্রায়ই নিয়ামতের কথা। ছেলে-মেয়েরা—চাচা, জোয়ানরা—ভাই, বুড়োরা—বাবাজী বলতে অজ্ঞান। তার সমবয়সী যারা, তারা কেবল নাম ধরে ডাকে। তবে তার নামটা কেউ কোনদিন বিকৃত করে ডাকেনি। কেবল বুড়ো সর্দারের, 'পরে তার রাগ হয়। সে-ই কেবল তাকে নিম্‌তে বলে ডাকে। তাই সে দরকার না হলে, তার সামনে কোনদিন যায় না।

॥ ৩ ॥

নিয়ামত কেবল কাপড় ছেড়ে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিল। এমন সময় পূব পাড়ার সালেহার বাপ বাইরে থেকে ডাকলো—ও নিয়ামত! আরে বাড়ী আছ নাকি?

ঘরের মধ্য থেকে সে কথা বললো—কে, নূর আলি ভাই? আরে বসো, বসো। আমি আস্‌ছি।

নিয়ামত হুকোটা সেজে নিয়ে বাইরে নেমে এলো। ততক্ষণে আরও দু'চার জন এসে বেঁদেপ্যাটি অধিকার করেছে। নিয়ামত হুকোয় কয়েকটা ছোট টান দিয়ে একটা লম্বা দম মেরে বাবর আলির দিকে এগিয়ে দিল। বাবর আলি হুকোটা হাতে নিতে নিতে বলে—তামাক খাওয়ার কি আর ইচ্ছা আছেরে ভাই! মন ভাল না থাকলে, কিছু ভাল লাগে কারও? মাঠের ধান পাটগুলো সব মরে গেল, তা' এ বছর খাব কি! বাবর আলি যেন কথাটা পেড়ে সবার অন্তঃটাকে গলিয়ে দিয়েছে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে নূর আলি বলে- সে কথা তুমি বলছো ভাই! সেই চিন্তা করতে করতেই তো দিন রাত কেটে যাচ্ছে। বিলের মধ্যে আমার অতো বড় বন্দের ভুঁইখানায় কি রকম ধানের জাউলা হলো—আর কি হয়ে গেল। সে ধান কি! কার হয়েছিল অমন ধানের জাউলা! শেষে সব মাজে পোকা লেগে মরে যাচ্ছে। এখনও যদি পানি হ'ত, তা'হলে অনেক ধান বেঁচে যেত। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সংসার, আহ্! কি খেয়ে বাঁচবে ছেলে-মেয়েরা!

আফছার এতক্ষণ মাথা নেড়ে তাল দিচ্ছিল। এবার সে বললো—সে কথা আর কি বলবো নূরো ভাই! তোমার তো আমন ধান মরে যাচ্ছে, আমার যে আউস ধানে পোকা লেগেছে। আমন ধান উঠবে পৌষ মাসে। অতোদিন বেঁচে, তারপর তো ধান! এতোদিন কি খেয়ে বাঁচতে হবে, যদি আউস না হয়। দেখ, আমার ভাগাড়ের ভুঁইটার কি রকম ধান হ'ল। ওতে বারো

গাড়ী গোবর সার দিলাম। এমন জমির এমন ধান! কিসে কি হয়ে যাচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছিনে। আরে ভাই বলবো কি—পাপ! দেশে পাপ ঢুকেছে।

নছর মণ্ডল একটা কথা না বলে পারলো না—ধানতো যাচ্ছেই, তা'ছাড়া পাটে একেবারে আগুন লেগেছে। রাজ্যির পোকা যেন এবার আমাদের এদিকে। এক একটা গাছে যেন দশটা বারোটা। আরে খাবি, না হয় পাতাগুলো খা; কিন্তু একেবারে মুণ্ডু মুড়িয়ে খেলে আর বাড়বে কি করে। তুমি ঠিক কথাই বলেছো আফছার চাচা, দেশে সত্যি পাপ ঢুকেছে। নইলে এতোকাল তো এমন দেখিনি। মানুষ যত পাপ করছে, দেশে আকালও সে-রকম বাড়ছে। কি বলো নিয়ামত, কথাটা ঠিক নয়?

নিয়ামত কিন্তু এসব আলোচনায় কথা বলে না। সে জানে—মানুষের কোন ব্যাপারে হাত নেই। খোদা মানুষ বানিয়েছেন, খোদায় তার খাওয়া পড়া দিবেন। নছর মণ্ডলের প্রশ্নে সে কোন কথা না বলে পারলো না। বললো—তা' তুমি যা' বলছো চাচা, কথাটা একেবারে মিথ্যে বলা যায় না। তবে কথা হচ্ছে কি, এসব কথা আলোচনা করে কোন লাভ নেই। কেন না, খোদা যা' করবেন, তা' করবেনই। আমাদের মত গরীব মানুষের হা-পিত্তিস করে কোন ফল হবে না।

নিয়ামতের কথা শেষ হলে লবা বললো—তা' নিয়ামতের কথাই ঠিক। কি হবে ওসব চিন্তা করে। ভাগ্যে যা' লেখা আছে, তা' হবেই।

লবা নূর আলীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—দাও নূরো ভাই, হুকো দাও। একলা আর কতক্ষণ টানবা। আমাদের দিকে একটু দেবে না?

নূর আলী হুকোটা চোয়ালে মুছে লবার দিকে এগিয়ে ধরে। কিন্তু লবার হাতে পৌঁছায় না—মাঝ পথে আফছার ছিনিয়ে নেয়।

লবা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে—ও, তোমার আবার দেখছি মরণ নেশায় ধরেছে। তোমরা সব খেয়ে ফেললে, তা' আমরা খাব কি?

নিয়ামত বলে—আহ্! তোমরা অতো রাগ কর কেন? তামাক ফুরিয়ে গেলে দাও না কলকেটা, আর এক সিলিম সেজে এনে দিই।

এ-কথা সে-কথা—দশ কথা, বিষ কথা পেড়ে দু'চার কলকে তামাক ধ্বংস করে প্রতিবেশীরা সব যার যেই বাড়ী চলে যায়।

নিয়ামত বেঁদে পাটিটা তুলে বার দুই ঝাড়া দিয়ে গুটিয়ে হাতনেয় তুলে রাখে। একবার গোয়ালের মধ্যে ঢুকে নান্দায় দু'টো জাওনা দিয়ে দামড়া দু'টোর গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—নে, তোরা খা, আমি যাই।

নিয়ামত হাতনেয় এসে বসে। সখিনা স্বামীর ভাত-তরকারী গামলায় করে বেড়ে নিয়ে আসে। নিয়ামত খেতে বসে। কয়েক গ্রাস মুখে দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—তুমি খেয়েছো?

—না।

—কেন?

—তোমাকে না খাইয়ে আমার খেতে আছে বুঝি?

—কে বলেছে এ কথা?

—বলবে আবার কে!

—তবে খাও না কেন?

—তোমার অতো কথার দরকার কিসে? তুমি খাচ্ছো, খাও। আমি তো আর না খেয়ে মরে যাচ্ছিনে!

নিয়ামত আর কথা বাড়ায় না। সে জানে স্ত্রীর সাথে তর্কে সে কোনদিন জিততে পারেনি। সে তাড়াতাড়ি খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে গামছায় মুছে ফেলে। সখিনা স্বামীর জন্যে এক কলকে তামাক সেজে দিয়ে থালা বাটিগুলো তুলে নিয়ে রান্না ঘরে যেয়ে খেতে বসে।

সখিনা খেতে বেশী দেরী করে না। কেন না, এখনও তার অনেক কাজ। বাটা-ঘটি পরিষ্কার করা, রান্নাঘর ঝাড় দেওয়া, ভাতের হাড়িতে পানি দেওয়া। এখনও স্বামীর জন্যে বিছেন পাতা হয়নি। সারাদিন মাঠে খাটুনি খেটেছে, এখন রাতে একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়বে। তার ভুল হয়েছে। স্বামীর বিছেনটা আগে পেতে না দিয়ে তার খেতে আসা উচিৎ হয়নি। সে তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে টেমীটা হাতে নিয়ে ঘরে চলে এলো।

গরমের দিন। ঘরের মধ্যে শোয়া যায় না। শুলে ঘুম আসে না। ঘেমে নেয়ে খালি এপাশ-ওপাশ করতে হয়। বাব্বা! এ যে গরম, এতে তালপাতার পাখার বাতাস আর কতক্ষণ করতে পারা যায়! সখিনা হাতনেয় বিছেন পাড়ে। নিয়ামত হুকোটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বিছানার উপর গড়িয়ে

পড়ে। সখিনা ঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে স্বামীর পাশে বসে বেশ কিছুক্ষণ বাতাস করতে থাকে। এক সময় সেও ঘুম পেয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

রাত গভীর হতে থাকে। গরম হাওয়াটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সমস্ত দিনের কর্মক্লান্ত মানুষ গাঢ় ঘুমে অচেতন। স্রষ্টার কি অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল! যে আকাশ সমস্ত দিন নিজের গর্ভে প্রচণ্ড দাবানল ধারণ করে প্রকৃতিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একাকার করেছে, সেই আকাশ এখন কোটী কোটী গ্রহ-নক্ষত্র বুকে নিয়ে শান্তভাব ধারণ করেছে। এই রাত শেষ হয়ে যাবে। আবার তাকে নিষ্ঠুর হতে হবে। তার কাছে কোন ন্যায়-অন্যায় নেই। কারও ওপরে তার হিংসা-দ্বেষ নেই। তার কোন শক্তি নেই, কোন সামর্থও নেই। সে এক অনন্ত পিপাসা। কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে সে একবার প্রচণ্ড অগ্নিপিণ্ড উদরস্থ করে নিজের ক্ষুধিত পিপাসা বাড়িয়ে নিচ্ছে, আবার নিজেকে শান্ত করবার দারুণ পিপাসায় নিজের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা বিসর্জন দিয়ে বুকের উপর দিয়ে আবর্ষনীয় পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে।

রোজকার মত রাত পোহায়ে গেল। পূর্বাকাশে দ্বিপ্রহরের জ্বালাময়ী খর নিক্ষেপ রত অগ্নিপিণ্ডটি শান্তশিষ্টের মত আস্তে আস্তে উঁকি দিল। সকাল বেলাকার সূর্যের এই নম্রতা দেখে কে বলতে পারে, একটু পরেই সে সমস্ত আকাশ-পথে দাবানল জ্বেলে একটা হিংস্রভাব ধারণ করে গম্ভীর মেজাজে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে যাবে!

সখিনা সেই কোন্ ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠেছে। উঠোন ঝাড় দিয়েছে, রান্নাঘর ঝাড় দিয়ে লেপে-মুছে পরিষ্কার করেছে। থালা-বাসন, হাড়ি করাই মেজে-ঘষে ধুয়ে এনেছে। দু কলসি রান্না করবার পানি নিয়ে এসেছে আগে থেকেই। সকাল সকাল না আনলে সর্দারদের পুকুরের এক হাঁটু পানি কাঁদা-কাঁদা হয়ে যাবে। তা ছাড়া বুড়ো সর্দার আবার একটু বেলা হলে পুকুরে কাউকে নামতে দেয় না। পানি ঘোলা হয়ে যাবে। পুকুরের মাছ মরে যাবে। আবার ওদের বাড়ীর পাল-পাল ছেলে-মেয়েরা যদি সারাদিন পুকুরের এক হাঁটু পানির মধ্যে গড়াগড়ি যায়, তা'হলে কোন ক্ষতি নেই। তখন পানি ঘোলা হবে না, মাছও মরবে না। আবার এতবড় একটা পাড়ার মধ্যে মণ্ডলদের বাড়ীতে মাত্র একটা পাকা ইন্দিরা ছাড়া খাবার পানির জন্যে

আর কোন অবলম্বন নেই। বেলা বাড়লে সেখানে আবার ভীড় হবে। পাড়ার সব মেয়েরা সেখানে এসে জমবে। যার সেই এসে কলসী ভরে নিয়ে সরে পড়লে হয়। তা তো হবার উপায় নেই। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। এক যায়গায় দু'টোর' পরে চারটা জমলে শান্তশিষ্টা ভদ্র মহিলাটাও বখাটে হয়ে যায়। সাত পাঁচালী করতে করতে যখন পুরুষরা আসতে শুরু করে তখন উঠে পড়ে সেই কলসি ভরে সরে পড়ে। সখিনার কিন্তু এসব মোটেও ভাল লাগে না। তাই সে কারও সাথে বড় একটা মেশে না। তবে যদি ওর বাড়ী যায়, তা'হলে তাড়াতাড়ি তো ছাড়বেই না, পরন্তু ও ভুলে যাবে নিজের পড়ে থাকা কাজের কথা। পথের মাঝে কারও বাড়ীতে পুকুর-ঘাটে ইন্দিরা-ঘাটে কোন যায়গায় সে কারও সাথে একটি কথা বলবে না। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে দু'এক কথায় সেরে নেয়। কেউ না আসতে সখিনা ইন্দিরা থেকে দু কলসী দু'ভাড় পানি নিয়ে আসে। গরমের দিন সারাদিন আবার পান করতে হবে তো!

নিয়ামত সকালে উঠে এক বদনা পানি নিয়ে মাঠের দিকে যায়। পাড়াগাঁয়ে তো আর কারও বাড়ীতে পায়খানা নেই। যদিও থাকে তো, হয়তো বাগানের মধ্যে একটা গর্ত কেটে দু'টো কাঠ ফেলানো। বেশীর ভাগ গাছপালার আড়ালেই কাজ হাসিল হয়।

নিয়ামত বাঁশ বাগানের মধ্যে থেকে বেরিয়ে বদনা ধরা হাত দু'টি পেছনে বেঁধে তার বন্ধের ভুঁইয়ের আঁলের উপর এসে দাঁড়ায়। ধানের চারার দিকে একবার তাকিয়ে তার বুক ফুরে বেরিয়ে আসে একটা বেদনাদায়ক দীর্ঘ নিশ্বাস। রাতের আকাশটা বোধ হয় দিনের বেলায় প্রচণ্ড অগ্নিরশ্মিতে দগ্ধ হবার ভয়ে সমস্ত রাত ধরে কাঁদতে থাকে। তাই সকালের দিকে ধান পাটের চেহারাটা একটু জীবন্ত দেখায়। পাটের মাথায় হাত দাও—পানি, ধানের চারায় হাত দাও পানি, মাটিতে পা' দাও ভিজে ভিজে ঠেকবে। কেন ভিজে থাকে! কোথা থেকে আসে এ পানি! এ বোধ হয় রাতের আকাশের ভীত সন্ত্রস্ত অশ্রু। নিয়ামত ভাবে আকাশও তা'হলে কাঁদতে জানে! জানে বৈ-কি। কাঁদুক। খোদার আরশ কেঁপে উঠুক। পানিতে মাঠ-ঘাট ভরে যাক। ধান পাট নতুন জীবন পেয়ে আনন্দে বাতাসের সাথে হেসে খেলে বেড়ে উঠুক।

অজান্তে যেন নিয়ামতের শুষ্ক চোখ দিয়ে দু' ফোটা পানি ঝরে পড়ে। উঃ! কি শক্ত জীবন এদের! রাতের বেলায় যে নিয়ের পড়ে, এটা যেন অমৃত। মানুষের জ্বর-জারী হয়। ডাক্তার কবরেজের দো'ফোটা পানি ঔষধ আর দু'টো একটা ছাগলের না'দির মত বড়ি খেয়ে রোগ মুক্তির প্রতীক্ষা করে। তবু কি বড়ি আর পানি ওষুধ খেয়ে ঝিমিয়ে থাকতে পারে! সাগু বার্লি আর ফলমূল না খেয়ে ক'দিনই বা মানুষ টিকতে পারে! নিয়মিত ওষুধের সাথে পথ্য খেয়েও যদি সেরে উঠে, তবু ভাঙ্গা শরীর সুস্থ হতে সময় লাগে আরও কয়েক মাস।

আর মাঠের এই ধান পাট! আজ পুরো একমাস খালি আধ ফোঁটা নিয়ের ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছে। নব-বধূর শ্বশুর বাড়ীতে নিঃশব্দ কান্নার মত রাতের কান্না ঝরা এক আধ ফোঁটা নিয়ের ঔষধ খেয়ে ধান পাট যেটুকু সুস্থ-বোধ করে, তা' একটু রোদ চড়তেই শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। সমস্ত দিন সূর্যের আগুন-লীলা তার উপর দিয়ে চলে। তবু এরা ধুক্‌তে ধুক্‌তে আজ একমাস বেঁচে আছে। এমনিভাবে আর কতদিন টিকবে এরা! এ যে মরণোন্মুখ ধানের চারাগাছ। এক একটা গাছ এক একটা চাষীর জীবন। চাষীর সমস্ত আশা-ভরসা। গোটা দেশের মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র মহৌষধ। নিয়ামতের গলাটাও ভিজে আসে। বলে – তুমি আর কতদিন এদের পোড়াবে আল্লাহ! তুমি একটু করুণা কর। আকাশে মেঘ আসুক। ঝর্ ঝর্ করে পানি হয়ে যাক। আমাদের প্রাণে আশা জাগুক। এমন করে আর তো পেরে উঠিনে খোদা!—নিয়ামতের দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে কয়েক ফোঁটা পানি ঝরে পড়লো।

বাড়ীর দিকে তার যেন ডাকের আওয়াজ শুনলো। হঠাৎ ওর মোহ ভঙ্গ হ'ল। ওহ্, তাইতো! বেলা যে অনেক উপরে উঠে গেছে। সে তাড়া-তাড়ি বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিল। আবার গাতায় যেতে হবেতো!

সখিনা সব কাজ সেরে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। নিয়ামত বাড়ী এলে তার হাত থেকে বদনাটা নিয়ে ভাল করে ধুয়ে এক বদনা পানি এনে দিল। নিয়ামত হাতে-মুখে পানি ছিটিয়ে ধুয়ে ফেললো। গরমের দিন।

দুপুর পর্যন্ত মাঠে থাকতে হবে। সকালের দিকে স্নান করে একটু শরীরটা ঠাণ্ডা না করলে মাঠে থাকতে খুব কষ্ট হয়। তা ছাড়া শরীরটা বড় কড়া হয়ে যায়। মাথা ভার হয়, গা জ্বালা করে। বুকের মধ্যে টিপ টিপ করে। একে তো বেশ খানিক বেলা হয়ে গেছে, তারপর আবার সর্দারদের পুকুরে যাওয়াও নিষেধ। স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সখিনা এক ভাঁড় পানি এনে দেয়।

॥ ৪ ॥

নিয়ামত তাড়াতাড়ি টোকাটা মাথায় দিয়ে নিড়ুনটা বগলের তলে চেপে হুকো টানতে টানতে দামড়া দু'টো মাঠের দিকে খেঁদিয়ে নিয়ে চললো। আজ আবার লবার গাঁতা। সে কিছু বলবে না। তবু তার উচিত হয়নি এত বেলা করে মাঠে আসা। লবা তো কোন দিন তার গাঁতায় দেরী করে যায়নি। নিয়ামত গরু দু'টো আমতলে নিয়ে যেয়ে গোঁজ পুঁতে রাখলো। একটু পা চালিয়ে লবার জমির আঁইলে যেয়ে দেখলো তাদের একখানা পাই উঠে গেছে। আর একখানা পাই কেবল ধরেছে। আফছার তাকে দেখে বললো—আরে! এই যে নিয়ামত এসে গেছে। আমরা মনে করছিলাম, তুমি আজ আসবে না। ও-পাশ থেকে দবির হাঁক দেয়—ওরে ও নিয়ামত ভাই! আরে হুকোটা একটু সেজে নিয়ে এসো। এসে পর্যন্ত তামাক খাইনি। ভুঁইওয়ালা তো হুকো আনেনি—শুধু আগুন তামাক নিয়ে এসেছে। আরে নবাবের ব্যাটা নবাব, তামাক আগুন দিয়ে কি করবো গো। হুকো না আনলে খাব কি করে। নিয়ামত ভাইকে যেন সবায় পেয়ে বসেছে। ও যদি হুকো না নিয়ে আসে, তাহলে নবাবের পুত্তুরদের আর হুকোর দম্ দিতে হয় না। যদি একদিন নিয়ামত ভাই না আসে, তাহলে কি হবে বলো দিনি।

দবির একটু তামাক বেশীই খায়। তাই হুকো তামাকের চিন্তাটা তারই একটু বেশী। যদি একদিন নিয়ামত না আসে কিংবা একদিন ভুলক্রমেই হুকোটা বাড়ী ফেলে আসে, তা'হলে সেদিন যে কি দুর্গতি হবে, সেই চিন্তায় দবির অস্থির। কেন না, নিয়ামত ছাড়া আর কেউ হুকো মাঠে নিয়ে যায় না। তাই সে সকলকে এ সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী করে দিল।

সকলের ডানে নিয়ামত বসে। সে নিজের গাঁতা হোক আর পরের গাঁতা হোক। সকলের গাঁতায় তার সমান কাজ। আজ আর তার ডানে

বসা হল না। তার আসতে দেরী হওয়াতে সবাই ডানে বসেছে। নিয়ামতকে আজ একেবারে বায়ে যেয়ে বসতে হল। মনটা যেন তার আজ কেমন দমে গেছে। কাজ করতে মন লাগছে না। শরীরটায় কেমন যেন আলিসি আলিস্যি ভাব ঠেকছে। তবু কি কারও বুঝবার উপায় আছে! নিয়ামতের গায়ে যদি একশো ডিগ্রী জর বয়, তবুও কেউ ধরতে পারবে না যে, তার শরীর খারাপ। সে-ও কারও কাছে ধরা দেয় না।

জমির ঘাস তুলতে সবাই যেন হাঁফিয়ে উঠে। নছর এক সময় বলে! বাবারে বাবা! দেশে আর কোন যায়গায় ভাঁদলা ঘাস আছে? সব যে দেখছি লবা বাবাজির ভুঁইতি। এতো ভাঁদলা বাঁধালে কি করে চাচা! যে ঘাস বেঁধেছে, আর যে তাত পড়ছে—সব ভাঁদলার যদি গোড়া তুলতে হয়, তা'হলে একটা ধানের গাছও থাকবে না!—লবা হুঁশিয়ারী করে দেয়।

—একটু দেখে শুনে মেরো। একে তো তাত খেয়ে খেয়ে আধ-মরা; তারপর আবার গাছে বেশী আঘাত লাগলে একেবারে মরে যাবে।

নছর বলে—তা'হলে দু'টো একটা ভাঁদলা কেটে যাই?

—কেঁটে যাবা কেন, তুলে যাও। মাটি তো বেশ শল আছে। অতো তাড়া-হুড়ো করতে হবে না। আস্তে আস্তে যাও—পরিষ্কার করে নিড়োও। ওপাশ থেকে ধমকে উঠবে আফছার।

লবা ডাক দেয়—ওরে ও নিয়ামত, কি হলো তোর আজ! কথা বলছিসনে যে বড়, শরীল খারাপ করলো নাকি?

—তা' সত্যি, নিয়ামতের নিশ্চয় আজ কিছু হয়েছে। নয়তো—ওতো চুপ করে থাকবার মত ছেলে নয়। তা' বাবাজী কি হল তোমার?—জিজ্ঞেস করে নছর!

নিয়ামত হাসে। বলে—কিছু হয়নি গো, চাচা!

—তবে অমন মুখ বুজে আছো কেন? তোমরা সবাই কথা বলছো—আমি শুন্‌ছি। আর কথা হচ্ছে কি, জানো চাচা! আকাশে একটু পানি নেই। রোদ যেন গায়ে এসে ফুট্‌ছে! মন মিজাজ এখন একটু খারাপই হয় বৈ কি!

নিয়ামত যেন সবার অন্তরের দুঃখটা উস্‌কে দিল।

সবার মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ নছর মণ্ডল বলে—তা' বাবা ঠিক কথাই বলেছো। মন ভাল না থাকলে কি মুখে কথা ফোটে! তা' দিন কাল যা' যাচ্ছে, তাতে মন খারাপ হওয়ারই কথা। আস্তে আস্তে দুনিয়া যেন কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুর শক্তি নেই। আমরা ছোটবেলা দেখেছি জ্যৈষ্ঠের বিদে বাষুই দেওয়া শেষ হয়েছে, আর অমনি আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। তারপর ঝুপ ঝাপ পানি। সে কি পানিরে বাবা! যেন আকাশ ফেটে পানি ঝরছে। সেই পানি মাথায় হাতনের বসে কেবল হুকোর তামাক পুড়িয়েছি আর গান ধরেছি। এখন যেমন জমিতে ঘাস ফুটে, তখন কি এমন করে ফুটতে পারতো! নীচের দল জমিতে তো একবারের বেশী নিড়ুন দিতে হত না। সব সময় পানি থাকতো ধানের গোঁড়ায়। আর উপরে বেলে জমিতে খুব ঘাস উঠতো। কিন্তু আমরা কি ছাই এখনকার মত এমন পরিষ্কার করে নিড়ুতাম। ধান ঘাস এক সাথে ঠেলে উঠতো—তারপর বড় হলে কাঁচি দিয়ে গরুকে কেঁটে খাওয়াতাম। গরু-ছাগল তখন কি এখনকার মত এমন করে না খেতে পেরে শুঁকিয়ে মরতো!

এক সময় নিয়ামত বলে—ও চাচা! কাল নাকি নামাজ পড়তে যেতে হবে?

লবা বলে—আমিও তো শুনছিলাম, খুকীর মা বলছিল। ও-পাড়ার মৌলভী সাহেব নাকি কাল সন্ধ্যেবেলা পাড়ায় পাড়ায় বলে গেছেন।

নছর মণ্ডল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, তা'—নামাজ পড়া ছাড়া আর কি কোন উপায় নেই? আজ প্রায় মাস পুরতে গেল, এমন তাত হচ্ছে। এ-তাত আর কত দিনই বা সহ্য করা যায়! নামাজ পড়লে আল্লা নিশ্চয় পানি দেবে। আমরাও অনেকবার নামাজ পড়েছি। কেন, তোমাদের মনে নেই—গেলবারের আগের বারে সব নামাজ পড়তে গিইলে না! মৌলভী সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন—নামাজ না পড়লে বাঁচবার কোন উপায় নেই।

আর কেউ কোন কথা বলে না। বেলা সোজা হয়ে গেছে। আর একখানা পাঁই ধরে দিয়ে সব বাড়ীর দিকে চলে যায়।

পরের দিন আর গাঁতা বয় না।

সকালে ও-পাড়ার মৌলভী সাহেব আর পূর্ব পাড়ার মিয়া সাহেব বলে গেছেন—তোরা কেউ আজ মাঠে যাস্‌নে। নামাজ পড়তে যেতে হবে। বিলের ধারে রোয়া ধানের মাঠ আছে, সেখানে চারপাশে গাছ-পালা নেই। নামাজ পড়বার উপযুক্ত স্থান; মিয়া সাহেব আর মৌলভী সাহেব আগেই ঠিক করে রেখেছেন।

নিয়ামত আর সকলের মত সকালে দামড়া গরু দু'টো মাঠে নিয়ে যায়। মাঠে ঘাস তো নেই! যা অল্প-সল্প আছে, তা' সকালের দিকে সতেজ হয়ে উঠে। গরু দু'টো সকাল করে খাইয়ে না আনলে ওদের আর খাওয়া হবে না।

বেলা এগারোটার দিকে গ্রাম শুদ্ধ সবায় বেরিয়ে পড়ে নামাজ পড়ার জন্য। ঝোঁকে পড়ে অনেক ছোট ছেলেরাও বড়দের সাথে যায়। বড়রা কিছু বলে না। কেননা, ছোটরা নিষ্পাপ। ওদের অবুঝ মন। ওরা কিছু বোঝে না। তবু পানি হচ্ছে না তার জন্যে সকলে নামাজ পড়তে যাচ্ছে। এতটুকু তারা বুঝতে পারে। বলা তো যায় না—আল্লা কার দোয়া কবুল করবেন।

ফাঁকা মাঠ। চারপাশে গাছ-পালা নেই।

আকাশে সূর্য যেন আজ ভীষণ ভাবে ক্ষেপে গেছে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র কীটগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করবে। চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাথার উপরে যেন সূর্য তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলেছে। তাই তার দেহ হতে আগুনের লিক্‌লিকে হল্‌কা হুড়মুড় করে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই সাথে শত সহস্র হাত উপরের দিকে তুলে ঘাড় নীচু করে আল্লাহ্‌র কাছে আকুল ক্রন্দন করছে—ও আল্লা! আমাদের বাঁচাও। এমন করে আর পুড়িয়ে মেরো না। মাঠ-ঘাট সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ও আল্লা! তুমি করুণাময়, দাতা—দয়ালু। তোমার নাম রহমান-রহিম। আমরা কতিপয় গোনাহ্‌গার বান্দা—তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছি; মেহেরবান খোদা! আমাদের উপর করুণার বারি বর্ষন কর। অবুঝ শিশুরা ঝোঁকে পড়ে বড়দের সঙ্গে এসেছে, কিন্তু তারা আর কতক্ষণ

তিষ্টিতে পারে। এই প্রচণ্ড রোদে তাদের গা' মাথা যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ; ওদের মুখে কেবল—ও আল্লা! গেলাম গো। আল্লাহ, পুড়ে গেলাম, মরে গেলাম!

নামাজ পড়া সার্থক হল।

মাঠে যাবার সময় পুড়তে পুড়তে গেলে আর আসবার সময় ভিজতে ভিজতে এলো। দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। তারপর সে কি বৃষ্টি! আকাশ ফেটে যেন পানি ঝরতে লাগলো। গ্রামের লোক সব মুরগী-ভেজা হয়ে বাড়ীতে এলো। ঘরে ঘরে সে কি আনন্দ! সবার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো। ঘরের বৌদের আনন্দ—পানি হয়েছে, মাঠে ধান, পাট ভাল হবে—ভাদ্রমাসে উঠোনে ধান উঠ্‌বে—ধান মল্‌বে ; নতুন ধানের গুড়ো ফুটে পরিশ্রম ক্লান্ত স্বামী আর বায়না ধরা ছেলে-মেয়েদের পিঠে বানিয়ে খেতে দেবে। তাদের পরনে নতুন নতুন কাপড় উঠবে। পাড়ার বৌরা মিলে আমোদে হৈ হুলোড়ে সকাল বিকাল ঢেঁকিশালে চিড়ে ভান্‌বে। সেই কবে পাবে এমন স্বাদগন্ধপূর্ণ দিন, তার স্বপ্নে আজ ঘরে ঘরে বৌ ননদদের সে কি তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস। ছেলে মেয়েরা আমোদ করে—ধান, পাট হলে তাদের জন্যে রঙ্‌-বেরঙের জামা কাপড় আসবে ; কত রকম মিষ্টি খাবে তারা। সেই নতুন দিনের আলোর নেশায় শিশুরা বাইরে আকাশের ঘন ঘন মেঘ গর্জনকে তুচ্ছ করে ঘরের হাতনেয় দাপাদাপি হৈ-হুল্লোড় করছে। আর এদিকে হাতনেয় বসে চাষা ভাইয়ের আর এক চিন্তা। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে হুকোর দম দিয়ে চলেছে আর আগামী দিনের রঙিন চিত্র তার মনের পর্দায় একটার পর একটা সাজিয়ে যাচ্ছে।

নিয়ামত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ী এলো। সখিনা এতক্ষণ দাওয়ার উপর শীতল পাটি বিছিয়ে বসে বসে কাঁথা সেলাই করছিল। স্বামীকে বাড়ী আসতে দেখে তাড়াতাড়ি কাঁথাটা ভাজ করে ঘরের আঁড়ায় তুলে রাখলো। স্বামীর শুক্‌নো লুঙ্গিখানা নিয়ে হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। নিয়ামত

বাইরে ডঁর কোলে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কাপড়খানা নিতে নিতে একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো—কি হলো আবার, মুখে যে খুব হাসি দেখছি।

সখিনা হাসতে হাসতেই বললো—হয়নি কিছু, রোদে পোড়া, গরমে সেদ্ধ জীবনটা আজ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কিনা! তাই আপনিই মুখে হাসি এসে যাচ্ছে।

—তা' তো হাসবেই, মেয়েরা কেবল হেসে হেসেই দুনিয়া তোলপাড় করে তুলছে।

সখিনা জানে—আর কথা বাড়ানো উচিৎ নয়। কেননা, সে তার স্বামীকে চেনে। মেয়েদের কথা তুলেছে যখন, তখন তাদের কড়ি কুষ্ঠি মুখের মধ্যে দিয়ে উপড়ে ফেলে তবে থামবে। তাই সে বললো—অতো বকোনা, তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে হাতনেয় উঠো। নতুন পানি, বেশী ভিজলে সর্দি লাগবে।

নিয়ামত কাপড় বদ্‌লিয়ে শীতল-পাটির উপর এসে বসে পড়লো। সখিনা স্বামীর ভিজে লুঙ্গি জামা চালের বাতায় গুজে রাখলো। ভাত-তরকারী ঘরের মধ্যে বেড়ে কুড়ে ঢাকা ছিল। সখিনা ভাতের বড় বটি আর তরকারীর নোঙরাটা ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে স্বামীকে খেতে দিল।

নিয়ামত খেতে যেতে একবার স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো—খেয়েছো ভাত?

—না।

—কেন?

—খাইনি। তা' আবার কেন, একটা কথা রোজ রোজ বলতে হয় নাকি! একদিন না বলেছি—তোমার খাওয়া না হলে আমার খেতে নেই।

—আমি যদি একদিন বাড়ী না থাকি?

—সে আলাদা কথা! তুমি বাড়ী থাকবে না, আর আমি না খেয়ে মরবো! বাড়ী থাকা আর না থাকা—সে আলাদা কথা।

—আজ কিন্তু বেশ পানি—হল।

—তা সাত্যি, এ বছরে এমন পানি একদিন ও হয়নি।

—এমনভাবে মাঝে মাঝে হলে এবার কিন্তু ধান, পাট খুব ভাল হবে।

—সে আল্লাহ ভরসা।

নিয়ামত খেয়ে উঠে ভিজে গামছায়—হাত-মুখ মুছলে। সখিনার হাত থেকে হুকোটা নিয়ে টান্‌তে টান্‌তে বালিশে হেলান দিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। নিয়ামত ভাবে—প্রকৃতিকে বোঝা বড় কঠিন। এই কিছুক্ষণ আগে মানুষ ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে গরমে যেন সিদ্ধ হয়ে গেছে; রোদের তাতে গা-মাথা যেন তামা হয়ে গেছে। মাঠ-ঘাট আলো-বাতাস সব তেতে পুড়ে হাহাকার করেছে—পশু পাখি একবিন্দু পানির জন্যে মরিয়া হয়ে চীৎকার করেছে, মাঠে ধান, পাট পানির আশায় আজ প্রায় একটি মাস মরেও বেঁচে আছে। আর আজ দেখতে দেখতে সব ঠাণ্ডা করে দিল। কে বুঝবে সৃষ্টি জগতকে। কারও বোঝবার সাধ্য নয়! কেউ আশা করেনি—এমনভাবে পানিতে অল্প সময়ের মধ্যে মাঠ-মাট ভরে যাবে। চাষার অন্তরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাবে, চাষী বউয়ের মন খুশীতে ডগ্‌মগ করে উঠবে। দিকে দিকে কেবল আনন্দের সাড়া। কবে কোন্ ভাদ্রমাসে আজকের এই যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে তার রূপ নিবে, সেই আগামী দিনের রঙিন আশায় চাষী সমাজের মনে আজ সাড়া পড়ে গেছে। নিয়ামত ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক দিন পর আজ দুপুরে ঘুমটা যেন আপনিই চোখজুড়ে এসে গেল। সখিনা মুচ্‌কি হেসে বললো—বড় যে ঘুম আসছে না? স্বামীর পাশে সে কাঁথা সেলাই করতে বসলো।

॥ ৫ ॥

পরদিন সকালে নিয়ামত ঘুম থেকে উঠে নিত্য অভ্যাসমত এক বদনা পানি নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। হাওয়াটা আজ বেশ ঠাণ্ডা। তার কাছে বেশ মিষ্টি মিষ্টি ল্যাগছে। আকাশে ছোট ছোট মেঘ শিশুরা দক্ষিণ থেকে নাচতে নাচতে ছুটে উত্তর দিকে চলে যাচ্ছে। নিয়ামত তার বন্ধের জমির আঁইলে যেয়ে দাঁড়ালো। মনটা যেন নিমিষেই খুশিতে বাগ্-বাগ্ হয়ে গেল। গতকাল সকালেও সে এই জমির আইলে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজ আবার সকালে এসেছে। পর পর দু'টি সকাল তার কাছে যেন একযুগ মনে হচ্ছে। রাতারাতি একি পরিবর্তন! তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি কি আল্লা মানুষের 'পরে এমন করুণা করবেন! সে একবার চোখ দু'টো দু'হাতের চেটো দিয়ে ডলে নিল। আবার তাকালে মাঠের দিকে। না, সে ভুল দেখছে না। চোখ তার ঠিকই আছে। ওসব খোদার মেহেরবানী! আজ প্রায় দীর্ঘ একমাস ধরে মার্তণ্ডের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়ে মাত্র একটি রাত্রির মধ্যেই ধান পাটের চেহারা আশ্চর্য রকম ফিরে এসেছে। নিয়ামত জমির চার আইলের কোল একবার ঘুরে আসে। না—কোন যায়গায় ধান ছোপ খায়নি। সব যায়গায় সমানই জাউলা আছে। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে বাড়ীর দিকে চলে যায়।

ও-পাড়ার লবা এসে নিয়ামতের অপেক্ষায় বসে আছে। তাকে বাড়ী আসতে দেখে বলে—কি বলো নিয়ামত ভাই, আজ আর গাঁতা ববে না, না?

—না, বেশ পানি হয়েছে কিন্তু, জমিতে এখনও যায়গায় যায়গায় পানি বেঁধে আছে। জো' হতে এখনও দু'দিন।

—তা' যা বলেছো। সব খোদার মেহেরবানি। কেডা জানতো এবার রাতারাতি এমন পরিবর্তন হবে?

নিয়ামত ততোক্ষণে মুখ হাত ধুয়ে ফেলেছে। সখিনা কলকেয় তামাক আগুন দিয়ে তার হাতে দিয়ে গেল। সে বার কয়েক টেনে একটা লম্বা দম নিয়ে

ডান হাতের মাস্থল দিয়ে মুখটা মুছে লবার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে— এ দুনিয়ায় তা'হলে এখনও ঈমানদার লোক আছে, তা' নইলে কি আর এমন আজব পরিবর্তন কেউ কোন কালে দেখেছে! আমার মনে হয় এবার আবাদ খুব ভাল হবে।

—তা' হবে বৈকি, না'হলে আমরা সব কি খেয়ে বাঁচবো।—বলতে বলতে এসে দাঁড়ালো বুড়ো সর্দারের ছোট ভাই জুড়ন!

নিয়ামত একটা ছোট কাঠের ফিড়েন এনে জুড়নের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললো—নাও গো, বসো।

জুড়ন কাঠের ফিড়েনটা টেনে নিতে নিতে বললো—তা' দাও, একটু তামাক খেয়ে যাই। কাজ টাজতো আজ আর বেশী করতে হবে না।

—তা সত্যি, গরু ক'টা খাওয়ানো—ছাড়া তো আর কোন কাজ নেই। তার জন্যে অতো তাড়াহুড়ো কিসের? বেলা বাড়ুক, তারপর খেয়ে দেয়ে ধীরে সুস্থে এক সময় ওদের নিয়ে মাঠের দিকে গেলে হবে।

ইতিমধ্যে নূর আলি এলো। আফছার এলো। নছর মণ্ডল এলো। নিয়ামত সবাইকে একটি করে ছোট কাঠের ফিড়েন এগিয়ে দেয়। ওরা বসে পড়ে। আরম্ভ হয় সকলের সুখ দুঃখের কথা। আর নিয়ামতের তামাক ধ্বংস হয় কলকের পর কলকে। সে গরীব মানুষ, এতো লোকের প্রতিদিন দু'বেলা তামাক খাওয়াতে পারে না। তবো কথা হচ্ছে কি, সে সামনের ভিটেটায় প্রতি বছর তামাক লাগায়। ভিটে জমি, তামাকও খুব ভাল হয়। তাই সে সারা বছর নিজেতো খায়ই, তা'ছাড়া পাড়ার কতজন এসে তার বাড়ীতে তামাক খাওয়ার আড্ডা জমায়। তার মনে এতটুকু হিংসা নেই, কারও 'পরে রাগ নেই—কাউকে সে ঘৃণাও করে না। তার বাড়ীতে কেউ এলে তা' সে যেই হোক না কেন, আর যখনই হোক না কেন, সে হাসিমুখে তামাক সেজে এনে দেয়। ফকির ভিক্ষে করতে এসেও তার বাড়ীতে ভাত না হোক, এক সিলিম তামাক অন্ততঃ টেনে যাবে।

আফছার একবার বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে বললো—আজকেও বোধ হয় বৃষ্টি হতে পারে। দেখ, আকাশে কেমন মেঘ জমছে!

পূর্ব পাড়ার মিঞা সাহেব তার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। কথাটা শুনে তিনি বললেন—ওরে তোরা আল্লা-আল্লা কর। পানি আরও একটু হোক। জমিতে পানি বাঁধলে ঘাস ফুটতে পারবে না।

আপছার আবার বললো—তা' আপনি ঠিক কথাই বলেছেন চাচা! পানি হলে ভাল হয়। ঘাস আর হতে পারবে না।

ওরে বাবা! মুখে শুধু পানি পানি করলেই কি পানি হবে? একটু আল্লার নাম করতে হয়। ব্যাটা চাষার দল, শুধু হুকো টানলেই হয় না। মুখে আল্লার নাম নেই, কেবল পানি দাও। তা' পানি কি তোদের গা দেখে দেবে?

আর কেউ কথা বললো না। ওরা জানে এর পরে কথা বললে মিঞা সাহেব রেগে যাবেন। আর তিনি একবার রাগলে যা-তা বলে গাল দেবেন। তাই সবাই চুপ মেরে গেল। নিয়ামত তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে থেকে কাঠের চৌকিটা বের করে নিয়ে এসে বললো—বসুন, ভাই।

—কি বললি! তোদের এই তামাকের আড্ডায় আমাকে বসতে বলছিস! বলি আমি কি তামাক খাব এখানে বসে, না—বসে বসে ধোয়া গিলবো?

মিয়া সাহেবের ধমক খেয়ে নিয়ামতও চুপ মেরে গেল। তিনিও আর দাঁড়ালেন না। উঠোন পেরিয়ে পশ্চিম পাড়ার দিকে চলে গেলেন। তিনি চলে গেলে—নিয়ামত আস্তে আস্তে বললো—মিঞা সাহেব ঠিকই বলেন কিন্তু—আমরা পাপী, একদিনও নামাজ রোজার কথা মনে করিনে।

নিয়ামতের কথা শেষ হতে জুড়ন বলে—বাদ দাও মিয়া সাহেবের কথা। শুধু বলবে—নামাজ পড়, রোজা কর। আরে নামাজ, রোজা করলে কি পেটে ভাত হবে?

জুড়নের কথায় বাধা দিয়ে আফছার বললো—ও কথা বলো না জুড়ন, তোমাদের না হয় ভয় ডর নেই, তাই বুঝে সুঝে কথা বলবার দরকার মনে কর না। আমাদের ভাই ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার। আল্লাকে ভয় করে কথা বলতে হয়।

আফছারের কথা সকলে সমর্থন করে। জুড়ন পাত্তা না পেয়ে রাগ করে উঠে যায়।

জুড়ন উঠে গেলে নিয়ামত বলে—জুড়ন একেবারে ওর ভায়েদের মত হয়েছে। আল্লাহকে একটু ভয় করতে জানে না। একে তো আমরা নামাজ রোজা না করে পাপ করছি, তারপরে আবার যদি খোদাকে ভয় না করে যা-তা বলি, তা'হলে এতো পাপ যায়গা দেব কোথায়!

নছর মণ্ডল এদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ট। সে বলে—বাদ দাও জুড়নের কথা। একেবারে কাফের যাকে বলে। আল্লাহর ভয় করলে কি ওরা হাল-লাঙ্গল করতে পারতো! এই সেদিন এলো না ওরা! আর দেখতে দেখতে কত যায়গা-জমি করে ফেললো।

লবা বললো—সে কথা তুমি বলছো চাচা, দেখনি মনিরের জমিগুলো কেমন করে ফাঁকি দিয়ে নিল ওরা। আর নছিরনের—আহ্! বিধবা মেয়ে-লোক, আর তার ভাল জমিগুলো দেখলে না কি করে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে হাতের মুঠোয় পুরলো। একে তো মেয়ে মানুষ তারপর আবার বিধবা। দু'টো ছোট নাবালক ছেলের মা, একটু দয়াও হলো না ওদের।

নিয়ামত দেখলো প্রসঙ্গটা পাল্টিয়ে যেয়ে বেশ যমিয়ে উঠছে। তাই সে বাঁধা দিয়ে বললো—ওসব কথা আলোচনা বাদ দাও চাচা। আবার ওদের কানে গেলে হয়তো ঝাপিয়ে আসবে। যাদের জ্ঞান বলতে কিছু নেই, তাদের সম্বন্ধে এমন ভাবে আলোচনা না করাই ভাল। বলা তো যায় না—কে হয়তো কি বলতে কি বলে ফেলবে, আর ওরা কি শুনতে কি শুনে ফেলবে; অমনে গোঁয়ারের মত বিশ্রী গালাগালি দিতে আস্‌বে।

নূর আলী হুকোয় একটা লম্বা দম দিয়ে বললো—তুমি ঠিক কথাই বলছো, নিয়ামত ভাই! দরকার কি ওদের সম্বন্ধে আলোচনা করে ঝগড়া ফ্যাসাদ বাঁধানো। তবে কথা হচ্ছে কি—আমাদের উচিৎ ওদের এড়িয়ে চলা, আর ওদের ধোকায় যাতে না পড়ি, সে ভাবে চলা-ফেরা করা।

নছর মণ্ডল বললো—ওদের এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলছো—তা' কেউ পারবে না। দেখ না, ওদের মুখের কথা কেমন মিষ্টি। বড় সর্দারের তো

কথাই নেই! কথা দিয়ে তোমাকে এমন করে ভুলোবে, তুমি মনে করবে— ও যেন আমার কত আপন জন।

নূর আলী বললো—কথা সত্যি! কথা ওরা জানে। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে এমন করে বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে, তখন তোমার আর কিছু করবার থাকবে না।

লবা বললো—সে কেবল তোমার আমার মত লোকদের। মিয়া সাহেবদের সাথে এমন একটি চাল চালুক—দেখি ওরা কত মিষ্টি কথা জানে আর কতটুকু চালাকী করতে পারে!

নিয়ামত বললো—তা' পারবে না। মিয়া সাহেবরা যে পথে যাবে, সে পথে ওরা যাবে না। যারা ডাকাত, তারা সবল লোকদের ঘাড় ভেঙ্গে পয়সা লুট করে। ছিচকে চোর তারা দুর্বল লোকদের ঘরের মাটি ফেলে ছেড়া কাঁথা আর থালা বাটি ঘটি চুরি করে। যাদের পয়সা আছে, তাদের ঘরে যেয়ে সিঁদ দিতে ওদের কোন দিন সাহস হয় না। দরকার নেই ওসব ছিচকে চোরদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে, আবার শুনতে পেলে হয়তো ঘুমের মাঝে কবে এসে বাটি ঘটিগুলো চুরি করে নিয়ে যাবে।

নছর মণ্ডল বললো—যাদের যা' স্বভাব, তারা সেইমত কাজ করবেই। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চলো—যার যেই বাড়ী যাই। বেলা অনেক হয়ে গেছে।

নিয়ামতের উঠোন খালি হয়ে যায়। সেও উঠে বসে ঘরের হাতনেয়। সখিনা উঠোনে পড়ে থাকা ছোট কাঠের ফিড়েনগুলো আর চৌকিটা তুলে আনে। তেলের ভাড়টি এনে দেয় স্বামীকে। নিয়ামত তেল মেখে গোছল সেরে আসে। সখিনা মুখে হাসি ফুটিয়ে আব্দারের সুরে বলে—দেখ, তোমাকে না বলে আজ একটা কাজ করেছি, কিছু বলবে না তো?

—কি?

—আজকের দিনটা ঠাণ্ডা যাচ্ছে। তা'ছাড়া কাল রাতে অল্প করে ভাত রান্না করেছিলাম তাই পান্তা ভাত ছিল না।

—তাই, কি?

—তা' খিঁচুড়ী রান্না করেছি।

সখিনার কথা শুনে নিয়ামত এবার হেসে ফেললো। বললো—ভাল করেছো।

সখিনা তবুও যেন ভরসা করতে পারলো না। সে স্বামীর ডান হাতখানা আকড়ে ধরে বললো—সত্যি, তুমি রাগ করলে না তো?

—না, রাগ করবো কেন?

—তুমি খাও কি-না—

—তুমি মনে করছো আমি খাইনে। আমার মা থাকতে কত খিঁচুড়ী খেয়েছি। একটু ঠাণ্ডা পড়লেই মা খিঁচুড়ী রান্‌তো। আর এ-কি খারাপ নাকি! ঠাণ্ডা পড়লে খেতে খুব ভাল লাগে। গরীবের বিরাণী! খাঁটি সরিষার তেল, গাছের কাঁচা টাটকা ঝাল আর পিয়াজ দিয়ে মাখিয়ে খাও, দেখবে বড়লোকদের বিরানী এর কাছে টিকবে না।

সখিনা আলাদা হয়ে পর্যন্ত খিঁচুড়ী রাধেনি। তাই সে ভেবেছিল, তার স্বামী না জানি কি বলবে। আজ মাথায় হঠাৎ কি খেয়াল হল—রেধে ফেললো, কিন্তু স্বামী যে কিছু গাল মন্দ না দিয়ে এমন খুশী হবে, তা ভাবেনি। স্বামীকে খুশী হতে দেখে সেও মনে বেশ আনন্দবোধ করলো।

নিয়ামত খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নিল। তারপর গোয়াল থেকে দামড়া গরু দু'টো বের করে হুকো টান্‌তে টান্‌তে মাঠের দিকে চলে গেল। কাজ আর আজ বিশেষ নেই, তবু গরু দু'টো খাওয়াতে হবে তো!

সখিনার ঘরের বাইরের যা সামান্য কাজ, তা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। স্বামী মাঠে চলে গেলে মণ্ডলদের ইন্দারা থেকে দু'বালতি পানি মাথায় দিয়ে এক কলসি পানি নিয়ে বাড়ী এলো। তার শরীরটা যেন আজ বিশেষ ভাল ঠেকছে না। মাথাটা যেন সেই সকাল থেকে অল্প অল্প ধরেছে। গা বমি বমি ভাব। এতক্ষণ খুব বেশী অনুভূত হয়নি। বেশী বাড়ার সাথে সাথে গা-হাত-পা টলতে লাগলো। আর বমি যেন এলো এলো ভাব। খেতে যেয়ে দু'গাল খেয়ে আর খেতে পারলো না। মাখানো খিঁচুড়ী ভাত হাস-মুরগীকে খেতে দিল। তারপর ঘরের মধ্যে খাটের উপর যেয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

বাড়ীর উঠোনে এসে ময়নার মা ডাকলো - বৌ, ও ছোট বৌ!

কোন সাড়া পেল না। আবার ডাকলো—ও ছোট বৌ!

সখিনা ঘরের মধ্যে থেকে উত্তর দিল—এই যে খালা।

—ঘরের মধ্যে কি করছিস লো?

—শুয়ে আছি, তুমি এসো।

ময়নার মা ঘরের হাতনেয় উঠতে উঠতে বললো—তা এমন অবেলায় শুয়ে আছিস কেন! অসুখ টসুক করেছে নাকি?

—না, অসুখ করেনি।

—তবে?

—গা-মাথা যেন পাক দিচ্ছে।

—বমি বমি ভাব হচ্ছে?

—হচ্ছে।

—মাথা ধরেছে?

—ধরেছে।

তা'হলে তো কাজ হয়েছে! আর একজন কোল জুড়তে আসছে। আর নির্ভাবনায় থাকলে চলবে না। পেট আর একটা বাড়তে চললো—বুঝেছিস রে!

সখিনা লজ্জায় মুখ ঢাকে।

—ইস, এমন সুখবরটা দিচ্ছি, আর উনি লজ্জায় মরে যাচ্ছে। তা' লজ্জাটা কিসের রে! মেয়ে লোকের মা হওয়া ছাড়া তার জীবনের কি কোন দাম আছে!

সখিনার বড় লজ্জা হয়। সে কথা বলতে পারে না। ময়নার মাকে একটু বসতে বলবে—তাও পারলো না।

ময়নার মা তার গায়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললো—তা' এমন হয়েই থাকে। আর পয়লা পয়লা একটু বেশীই হয়। আমার ময়না হওয়ার সময় লজ্জা হতো। কত লোকে কত কথা বলতো! তা' শুনে আমার খুব লজ্জা করতো। আর মেয়ে মানুষের লজ্জা করেই বা লাভ কি! ছেলে মেয়ের মা হওয়া তো ভাল কথা। ছেলে মেয়ে না হলে শ্বশুর শাশুড়ী বলবে—বৌ বেঝো; পাড়ার লোকে বলবে—আট্‌কুঁড়ে মাগী। কারও কিছু হলে বলবে—আজ সকালে ঐ আট্‌কুঁড়ির মুখ দেখে আমার এই ক্ষতি হয়েছে। সংসারের কোন অঘটন হলে শ্বশুর শাশুড়ী বলবে—এই আট্‌কুঁড়ে বৌ এসে আমার সব খ্যায় করে ফেললো। উঠতে বসতে গালাগালি। আর একটা সোনার চাঁদের মত ছেলে

মেয়েয় মা হয়েছো তো শ্বশুর শাশুড়ী পাড়ার মাগীরা পর্যন্ত বলবে –বৌ তো নয়, যেন সতী লক্ষ্মী। নিজের একটু কষ্ট হবে – তা' হোক, ওসব গালমন্দ শোনার চেয়ে নিজে কষ্ট সহ্য করাই ভাল।

সখিনার লজ্জা ভাব কিছুটা কাটিয়ে উঠে বসলো। প্রতিবেশী খালা শাশুড়ী এসেছে, তার সামনে এমন বেহায়াপনার মত শুয়ে থাকলে বলবে কি! তা' আবার যে সে মেয়ে না—ময়নার মা। তোমার বাড়ী এসেছে তুমি বসতে দাও, পান তামাক খেতে দাও, দু'চারটা সুখ-দুঃখের গল্প কর, যদি কিছু হাওলাত নিতে আসে, হাসি মুখে দাও—তা'হলে ময়নার মার কাছে তুমি ভাল হবে। তা'ছাড়া পাড়ার মেয়েরাও বলবে—ও বৌটা খুব ভাল ঘরের মেয়ে। একটু দেমাগ নেই। ভাল ঘরের মেয়ে না হলে অন্তর এমন সরল হয়! তোমার ভাল গাবে, সে-ও ঐ ময়নার মার দৌলতে। তোমার ভাল তো গাবেই, তা' সত্বেও তোমার জন্তে দোয়াও করবে। বেঁচে থাক বৌ, তোমার দু'টো-পাঁচটা ছেলে মেয়ে হোক, তারাও তোমার মত সুন্দর হোক। ময়নার মার উপকারের বদলাতে তোমার সুনাম। পাড়ার মাগীরা তোমার সুনাম করবে না? না করলে ময়নার মার গালাগালি থেকে রেহাই পাবে কেউ! আর যদি তুমি এর বিপরীত কাজ কর, মানে গেল তোমার বাড়ী, তুমি হয়তো শরীর খারাপ বলে বিছানায় শুয়ে থাকলে—আর শরীর ভাল থাকলো তো সংসারের নানা কাজে লেগে থাকলে—ময়নার মা এসে দাঁড়িয়ে থাকলো— তুমি শুয়ে থাকলে তোমার পাশে বসে দু চার কথা বললো, তুমি কাজ করতে থাকলে তো পিছে পিছে ঘুরে দু' এক কথা পাড়লো; তারপর গম্ভীর মুখে তোমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। তা' সে যোগে যাগে তোমার উঠোনটুকু পেরিয়ে যেতে পারলে হয়! সেই যে গাউনি ধররে অ র সমস্ত দিনটায় তেমনভাবে তার মুখে খৈ ফুটবে। আট্‌কুঁড়ের মেয়ে আট্‌কুঁড়ে, ওরে ওর বংশ নিপাত যাক। সকালবেলা আল্লা রছুলের নাম করে ওর বাড়ী গেলাম, তা মাগীর দেমাগ দেখলে হয়ে আসে। তা' ও মাগীর এতো গুমোন হলো কিসে! গুমোরের ঠ্যালায়—কথা পর্যন্ত বললো না। ষোল কলানী মাগী, আমি কি তোর চৌদ্দ-পুরুষের খেয়ে পরে থুইছি যে, তুই আমার সাথে কথাটি পর্যন্ত বললি নে।

ময়নার মা একা একা তো বকবেই—আর যদি সামনে কারও পেয়েছে, তা'হলে তো উপায় নেই। যাকে সামনে পাবে, তার কাজের ক্ষতি তো হবেই; তা'ছাড়া ময়নার মার গাউনি শুন্‌তে শুন্‌তে মাথা ধরে যাবে। আবার না শুনলে উপায় নেই। একটা বাদ দিয়ে আর একটা ধরবে। পাড়ার ছোট থেকে বড়রা পর্যন্ত তাকে ভয় করে চলে। ময়নার মা যার ভাল গাবে, সবাইকেই তাকে ভাল বলে স্বীকার করতে হবে, আর ও যার মন্দ বলবে, তাকে সবাইকে মন্দ বলতে হবে। যে ওর দিকে গ'ড় দেবে না, তার চোদ্দ গুষ্টির মাথা খেয়ে তারপর ময়নার মা পানি গ্রহণ করবে।

সখিনা মাথা নীচু করে শুয়ে শুয়ে ময়নার মার কথা শুনছিল। হঠাৎ যখন তার স্বভাবের কথা মনে হল, তখন সে সমস্ত লজ্জা সরম ঝেড়ে ফেলে উঠে বসলো। তক্তপোষের একপ্রান্ত শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঝেড়ে ফেলে হাসি মুখে বললো—বসো খালা!

ময়নার মা আর কেউ হলে দু'কথা শুনিয়ে দিত—তা' গতর খেকো মাগী! কোন্ সাত সকালে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজাব খাটছি, আর উনি দিব্বি আরামে নাক ডাকাচ্ছেন। কিন্তু সখিনাকে কিছু বললো না। কেননা, তার যখন যা দরকার হয়, দৌঁড়ে আসে সখিনার কাছে। সখিনা গরীবের বৌ, ওর কাছে সব সময় সব জিনিষ থাকে না; না থাকলে ময়নার মা তাকে বড় একটা দোষারোপ করে না। আহ! ব্যাচারী গরীব, না থাকলে কি করবে। এমন আহাজারীও ময়নার মা মাঝে মাঝে করে থাকে—তা' কেবল এই সখিনার বেলায়, আর কারও জন্য নয়। এ পাড়ায় সে দু'টো বৌকে ভাল বাসে। একটি সখিনা আর একটি মিয়া সাহেবের বৌ মাসুদা।

সখিনা যখন তাকে বসতে বললো, তখন সে ডান গালে হাত দিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললো—বসতে তো বলবিই। কিন্তু আমার কি বলবার জো আছে! ভাত খাব তা' নুন নেই। এতো বেলা হয়ে গেছে, তা' আমাদের এখনও পান্তাভাত খাওয়া হয়নি, তা'—ঐ নুন অভাবে। বাদলা মাথায় লোকের বাড়ী আসতেও লজ্জা করে। তা' তোর আছে নাকি, দিতে পারবি একটু?

সখিনা মাথা নেড়ে একটু নুন মেপে দিল। ময়নার মা'র মনটা আজ একটু নরমই ছিল, তাই সে আর কথা না বাড়িয়ে লবন নিয়ে চলে গেল।

॥ ৬ ॥

নিয়ামত বাড়ীতে এলো দুপুর গড়িয়ে গেলে। নব-বঁধু শ্বশুর বাড়ী যেয়ে বাপের বাড়ীর সবার বিচ্ছেদে যেমন নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলে, তেমন পাতলা মেঘে ঘোমটা টানা আকাশ তার ঘোমটার ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ঝরছিল। গোয়ালে গরু দু'টি বেঁধে গামছার এক মুড়োর একটা টুপলা বাঁধা কি যেন এনে চেঁচেই দাঁড়িয়ে ডাকলো—কই, শুনছো?

সখিনা ঘরের মধ্যে কি করছিল। স্বামীর ডাকে বেরিয়ে এলো।

নিয়ামত পুটলাটা সখিনার দিকে বাড়িয়ে বললো—এটা ধর দিনি!

সখিনা পুটলাটা ধরতে ধরতে জিজ্ঞেস করলো—কি এর মধ্যে?

—খুলে দেখ।

সখিনা আগ্রহ সহকারে সেটা খুলে ফেললো। তার মধ্যে একসের টাক পটল! জমিতে নতুন ধরেছে। গত শুক্রবারে গোটা চারেক জুম্মায় দিয়েছিল আল্লার নামে। মূর্খ মানুষ। তারপর আবার চাষা।

কিছু বোঝে না। তবু তারা ক্ষেতে ফসল ফলালে বা তরি তরকারি ফলালে তার প্রথমটা কিছু খোদার নামে মসজিদে না দিয়ে কেউ খায় না। কারও বাড়ীর পালায়—লাউ কুমড়ো ধরেছে, যেটা আগে বেড়েছে, সেট মস্‌জিদে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঝাল, পটল, ঝিঙে যা' হোক না কেন, প্রথমট মস্‌জিদে দেবে। বেনামাজী নামাজ পড়ে না। তবু লোক না পেলে নিজে হাতে করে নিয়ে যেয়ে মস্‌জিদের বারান্দায় রেখে আসবে। অবশ্য গোপনে নিয়ে যাবে। আড়ালে আবডালে যেয়ে মস্‌জিদের সামনে পিছনে আমগাছট আর পেয়ারা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আগে দেখে নেবে সবাই নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছে কি-না। যদি না দাঁড়ায়, তা'হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি দেবে। নামাজে দাঁড়িয়ে গেলে আস্তে আস্তে মস্‌জিদের বারান্দায় টুক্‌ করে রেখে অমনে সরে পড়বে। নইলে মিয়া সাহেব আর মৌলভী সাহেবের দৃষ্টিতে পড়লে রেহাই নেই। বেশ করে দু'টো কড়া কথা শুনতে হবে—বেটা বেনামাজী,

পাঁজি কোথাকার। নামাজ পড়তে আসবে না, আবার লাউ-কুমড়ো নিয়ে এসেছে! আরে নামাজ পড়িসনে তা' আবার আল্লার ঘরে এ-সব কেন? আল্লা কি এসব দেখেই সন্তুষ্ট হন? বেটা পাঁজি! নামাজ পড়তে আস্‌বি।

মিয়া সাহেবই বেশী গালাগালি দেন। মস্‌জিদে আল্লার নামে রেখে আসা তরি-তরকারি, ফলমূল সব মৌলভী সাহেবের পাওনা হয়, তাই তিনি বড় একটা বেনামাজী বলে গালাগালি দেন না। কেননা, বেনামাজীর জিনিষ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। এমন কি তার মাসের বেতন পর্যন্ত এই সব বেনামাজীদের হাত থেকে কিছু কিছু আসে। তাই তিনি বড় একটা গাল ঝাড়েন না। তবে দায়ে পড়ে মিয়া সাহেবের কথার মাঝে মাথা নেড়ে সায় দেন। আবার যখন আল্লার ঘরে মানত আর আসে না, মৌলভী সাহেবকে যখন গাঁটির পয়সা ভেঙ্গে সব কিনতে হয়, তখন তিনি সুযোগ বুঝে একদিন পাড়ায় বেরিয়ে পড়েন। পান তামাক খান আর বেনামাজীদের উপর রাগ ঝাড়েন—ব্যাটা এজিদের গুষ্টি! নামাজ তো পড়বিনে, তারপর আবার আল্লার ঘরে দান টানও করবিনে! এতো পাপের যায়গা হবে কোথায়। মরবি সব পাপের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তবু আল্লার নাম মুখে নিবিনে। তা' নামাজ পড়তে যদি এতোই কষ্ট হয়, তা' আল্লার নামে মানত টানতও তো করতে হয়! এমনই সব ফাঁকা বুলি গেয়ে আসেন পাড়াময়। তারপর কয়েক জুম্মা বেশ কিছু আমদানী হয়।

সখিনা তার স্বামীকে বললো—এই সেদিন বললে না—গোটা চারেক ধরেছে, তা' মসজিদে দিয়ে এলাম, আজ আবার এতো পটল কি করে পেলে?

ছিল হয়তো পাতার ফাঁকে ফাঁকে; পানি পেয়ে বড় হয়েছে। তা' বেশ ধরা দিয়েছে! সামনের হাটে বোধ হয় সের দুই আড়াই উঠবে। গরীব মানুষ! কিনে তো খেতে পারবো না, এখন বেঁচে যদি দু' এক পয়সা পাই, তা'হলে—এই দুর্দিনে কিছুটা অভাব মিটবে।

—ঝিঙে গাছ পুঁতছিলে, তা' কেমন হয়েছে?

—গাছ খুব ভাল হয়েছে। এতদিন তাপ খেয়ে খেয়ে আধমরা হয়েছিল, নতুন পানি পেয়ে গাছের চেহারা ফিরেছে। আল্লায় দেয় তো—পয়লা

আষাঢ়ের দিকে তুলতে পারবো। এবার কুমড়ো লাগানো হয়নি। লাগালে কিন্তু ভাল হত। নছর চাচার খুব ভাল কুমড়ো গাছ হয়েছে।

—লোকের হয়েছে—সে কথা বলে আমাদের কি লাভ আছে। আমরা লাগাইনি, আমাদের হয়নি। সামনের বছরে লাগিয়ো—হবে। যা হয়েছে, ওই আমাদের ভাল।

নিয়ামত কাপড় ছেড়ে ঘরের দেওয়াল হেলান দিয়ে হুকো টানতে টানতে বললো—রাত্তে কি রানবা ?

—তুমি যা' রান্‌তে বলো!

—মাছ নেই, নতুন পটল। নিরেমিষে কি ভাল লাগবে ?

—না লাগলে আর কি করা যাবে। পয়সা না থাকলে, মাছ কিনবা কি দিয়ে ? আর তার জন্যে চিন্তা করে কি হবে! বরাতে থাকলে কত খেতে পারবো। সামনের হাটে পটল বেঁচে দু'টো মাছ নিয়ে এসো।

স্বামীর সাথে কথা বলতে যেয়ে সখিনার বার দু' বমি উঠতে উঠতে আর উঠলো না।

নিয়ামত জিজ্ঞেস করলো—কি হলো আবার ?

সখিনা স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু মুচকি হেসে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

—শরীর খুব খারাপ নাকি ?

সখিনা মাথা নেড়ে জবাব দিল—না, তার শরীর খারাপ হয়নি।

—তবে বমি হচ্ছে কেন ?

—তা' কি করে জানি।

—জ্বর-টর হয়নিতো, এদিকে এসো দেখি! নিয়ামত তার গা-মাথায় হাত দিয়ে বললো—শরীর দেখছি ভালই আছে। তবে আবার এমন হচ্ছে কেন ?

সখিনা মাথায় হাত দিয়ে ঘাড় নীচু করে বসলো—মাথাও ধরেছে নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছে, তা' ভাবীর কাছে জিজ্ঞেস করলে পারতে।

সখিনা মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো—জিজ্ঞেস করবো কি, তার আগে যে একজন বলে গেছে!

—কে বলেছে ?

সখিনা এবার লজ্জায় মাথা নীচু করে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলো।

নিয়ামত তার মাথায় হাত দিয়ে ঝাঁকি দিতে দিতে বললো – ময়নার মা কি বলেছে, বললে না ?

সখিনা নিরুত্তর।

নিয়ামত প্রীতি-মাখানো স্বরে বললো—আমার কাছে আবার লজ্জা! বলো, আমার সাথে বলতে আবার লজ্জা কিসের!

সখিনা লজ্জিত ও ছেলেমি কণ্ঠে বললো—কিছু বলেনি, যাও!

—কিছু বলেনি, তা' বললে কেন ?

সখিনা চুপ করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল মেঝের ঘষতে লাগলো।

নিয়ামত অভিমানে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—ঠিক আছে, বলো না। আমিও তোমার সাথে কথা বলবো না।

সখিনার নারী হৃদয়ের সমস্ত লজ্জা নিমেষেই পানি হয়ে গেলে স্বামীর হাত ধরে বললো—রাগ করলে তুমি ?

—রাগ করবো না কেন বল ? আমার কাছে তুমি কথা গোপন রাখতে চাও—বুঝেছি, তুমি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস না।

সখিনা ডান হাতের তালু দিয়ে স্বামীর মুখ চেপে ধরে বললো—খবরদার! তুমি অমন কথা বল না। সব কাজে তোমার বাড়াবাড়ি! এ দুনিয়ায় তুমি ছাড়া আমার অতি আপনার কে আছে, যাকে ভালবাসতে পারি। তুমিই তো আমার সব। আর তুমি সামান্য একটুতেই রাগ করছো।

নিয়ামত সখিনাকে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললো—ছিঃ! আমি কি তোমার উপর রাগ করতে পারি! সখিনা স্বামীর বেষ্টন থেকে সরে বসে বললো—তুমি একটা কি, বলতো ? দিন-দুপুরে হাতনেয় বসে তোমার ছেলেমিপনা! কেউ দেখে ফেললে কি মনে করবে ?

—তুমি কিন্তু আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ।

সখিনা আবার যেন লজ্জা পেয়ে বসলো।

নিয়ামত তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে ছেলেমি ভঙ্গিতে বললো—কই বল, আমার লক্ষ্মিটি!

সখিনা স্বামীর কোলের কাছে সরে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে বললো—ময়নার মা বলছিল—আমার নাকি ছেলে-মেয়ে হবে!

কথাটা বলেই সখিনা এক দৌঁড়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

নিয়ামত আনন্দ সংবাদটা শুনে যেন লাফিয়ে উঠলো—। কি! তুমি কি বললে? আরে, শোন, দাঁড়াও না ছাই! ভাল করে বল, শুনি!

সখিনা ততক্ষণে ঘরের মধ্যে তক্তপোষের 'পরে বালিশে মুখ গুজে শুয়ে পড়েছে।

নিয়ামত ডেকে সাড়া না পেয়ে উঠে যেয়ে তার গা ধরে ধাক্কা দিতে দিতে বললো—আরে ধোত্তর ছাই! উঠনা, ঘোড়ার ডিম! ময়নার মা কি বলেছে, একটু ভাল করে বল দিকি! সখিনা লজ্জায় কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। নিয়ামতের খোশামোদ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন সখিনা আর না উঠে পারলো না। স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে অভিমানের ভঙ্গিতে বললো—ইস্, তুমি যেন একটা কি! সব কথা তোমাকে ভেঙ্গে চুরে না বললে—বোঝ না!

নিয়ামত বোঝে সব। এক কথায় সে বুঝতে পারে। তবু স্বামী-স্ত্রী প্রেম ভালবাসার পরীক্ষা! মান-অভিমানের অভিনয় যেখানে প্রতি মুহূর্তে চলে. সেখানে এক কথা বার বার ঘুরিয়ে নিয়ে আসা একটা চিরন্তন রীতি। প্রেমের কাছে শিক্ষিত অশিক্ষিত নেই। শিক্ষিত জ্ঞানী দম্পতির মধ্যেই কেবল ভালবাসার মান-অভিমান সীমিত নয়, অশিক্ষিত মূর্খের মধ্যেও বিদ্যমান। শিক্ষিত দম্পতিরা দাম্পত্য জীবন এবং সে জীবনটা কি, আর কি ভাবে সেটা পালন করতে হয়—দাম্পত্য জীবনে সুখ কোথায়, কিভাবে চলাফেরা করলে সেই অফুরন্ত সুখ ভোগ করা যায়; সেই সুখের পরিণাম কি—এ-সমস্ত মোটা মোটা বই পড়ে শেখে। আর মূর্খদের শিখতে হয় না, সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ নিজেদের মনের মধ্যে খুঁজে পায় এ-সব জটিল তথ্য! মানব হৃদয়ে যখন অনুভূতি জেগে উঠে, তখন সে মনের দ্বারা বুঝতে পারে—কিসের এ আলোড়ন, কিসের এ শিহরন—কিসের এতো চঞ্চলতা। তখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মোহ এসে যায়। একের প্রতি অপরের প্রকৃত ভালবাসা তখনই জেগে উঠে। কাকেও শিখতে হয় না; শিখাতেও হয় না। সময় হলে অমনিতেই মানব

হৃদয়ে এ ঢেউ আপন ইচ্ছায় জেগে উঠে। এ কোনদিন পুরোনো হয় না! যুগ যুগান্তর ধরে চির নতুন রূপ নিয়ে নব যৌবনে পদার্পণ জীবনে নিঃশব্দে এসে প্রবেশ করে। তাই, স্বামী-স্ত্রীর এমন মধুর সম্পর্ক! তাই দাম্পত্য জীবন এতো সুখময়। তাই একের প্রতি অপরের মান-অভিমান, ছেলেমিপনা।

নিয়ামত স্ত্রীকে দু'হাতে আকড়ে ধরে। ভাবের আবেগে সখিনার অধরে একটা ছেলেমি চুমো দিয়ে বললো—আজ যদি মা-বাবাজান বেঁচে থাকতো, তা'হলে কত খুশীই না হতো। সখিনার মনে পড়ে যায় তার শ্বশুরের কথা। তিনি বলতেন—ছোট বৌর ছেলে-মেয়ে হবে, আমি তাদের সাথে খেলা করবো, গল্প বলবো—ছড়া কাটবো, গান গাবো। আগামী দিনে কত শত রঙিন স্বপ্ন দেখতেন ছোট ছেলে বৌকে কেন্দ্র করে। এমন একটা আনন্দ-পূর্ণ মুহূর্তেও সখিনার দু চোখের পাতা নোনা পানিতে ভিজে আসে। নিয়ামত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—ঐ দেখ, বাপজানের কথা বলেছি—আর অমনে চোখে পানি; কতদিন হয়ে গেল, তবু ভুলতে পারলো না। চিরদিন কি সবায় মনে রাখলে চলে! একদিন তুমি আমিও তো মরে যাব।

—ও ছোট বৌ!

বাইরে থেকে ডাক দিল সখিনার বড় জা, নিয়ামতের বড় ভাইয়ের বৌ পরিছন।

সখিনা তাড়াতাড়ি স্বামীর বেষ্টন মুক্ত হয়ে উত্তর দিল—এই যে বু'।

এই পড়ন্ত বেলায় ঘরের মধ্যে কি করছিস রে? বলতে বলতে পরিছন ঘরের মধ্যে উঠে এলো।

—শরীরটা বডডো খারাপ লাগছে, তাই শুয়ে আছি।

কি বললি! শরীর খারাপ! তোর আবার কোন কালে শরীর খারাপ হয় নাকি! আজ ছ'বছর এ সংসারে এসেছিস, তা' কোনদিন শুনলাম না বা দেখলাম না যে, সখিনা বিবির জ্বর হয়েছে বা শরীর খারাপ করেছে। আজকে যে বড় আজব কথা শুনছি—ব্যাপারখানা কি! আয় দিনি দেখি!

পরিছন রোজই ওকে দেখে গল্প করে, হাসি-তামাসা করে। কিন্তু কোন-দিন ওর অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখেনি। যখন তারা একান্নে ছিল, তখন পরিছন মনে মনে সখিনাকে ঘৃণা করতো। বাইরে অবশ্য মুখ ফুটে কিছু বলতে

পারতো না। কেননা, সখিনা হ'ল এ-বাড়ীর ছোট বৌ, সবাইর প্রিয়পাত্রী। বিশেষ করে শ্বশুর সখিনাকেই বেশী ভালবাসতেন। শুধু সেই কারণেই পরিছন তাকে ঘৃণা করতো না, এ সংসারে এসে পর্যন্ত তার কোনদিন জ্বরজারী হয়নি, তাদের হয়তো একটু শরীর খারাপ করেছে বা জ্বর-জারী হয়েছে তখন সমস্ত সংসারের ঘানি সখিনাকেই টানতে হয়েছে। অল্প বয়সে সংসারে এসেছে তবু তার কোনদিন শরীর খারাপ হয়নি। তাই শ্বশুর বলতেন—ছোট বৌমা যেন সাক্ষাৎ ভাগ্যলক্ষ্মী, তাই এতো অল্প বয়সে এতো পরিশ্রম করেও কিছু হয় না। তারপর শ্বশুর মারা গেলে যতদিন একান্নে ছিল, ততোদিন পরিছন ইচ্ছে করেই নানা ওজর-আপত্তি দেখিয়ে সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম রান্না-বান্না সখিনাকে দিয়েই করিয়ে নিত। পরিছন 'ছেলে কানছে' বলে বিছেনে কাৎ হত আর উঠতো—স্বামী দেওরের মাঠ থেকে বাড়ী আসবার সময় হলে। সখিনা আর কি করে! অতিরিক্ত পরিশ্রম হলেও সব কাজ তাকে করতে হত। যদি একটু কাজ বাকি পড়ে থাকতো, তা'হলে স্বামী ও অন্যান্যরা বাড়ী এলে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো—ছোট বৌয়ের দিয়ে কিছু হবার উপায় আছে! একটু ছেলে কানছিল, বললাম ছোট বৌ! ও কাজটা তাড়াতাড়ি করে ফেল। ওদের আবার বাড়ী আসবার সময় হয়ে এলো। তা সে কাজটা কি আর হলো! আমি হাত না লাগালে আর হবে না। ছোট বৌ সব বুঝতো, তার জা' যে তার উপর হিংসা করে, তা' জেনে শুনেও কিছু মনে করতো না বা স্বামীর সাথে কিছু বলতোও না।

তারপর যখন ওরা পৃথক হল তখন জিনিষ-পত্তর, গরু-ছাগল হাঁস-মুরগী ভাগাভাগি নিয়ে সে কি ঝগড়া ফ্যাসাদ! অবশ্য সখিনা কোন কথা বলেনি। গ্রামের মাতব্বর মুরুব্বিরা যখন ন্যায়তঃ ভাগাভাগি করে দিয়ে গেল, তখন পরিছনের সে কি গলাবাজি! হাড় হাভাতে লক্ষ্মীছাড়ার দল সব চোখের মাথা খেয়ে এসেছে বিচার করতে। আরে নিয়ামত কামাই করেছে, না তার মাগী কামাই করেছে যে, সব সমান ভাগ পাবে! পরিছন তার সখের জিনিষ পত্তর কিছুই তাদের দেয়নি। আবার এলো তাদের আত্মীয়েরা ভাগ বাটোয়ারা করতে। তবু পরিছনের সেই একই কথা, এটা দেব না, ওটা দেব না। শেষ পর্যন্ত কেউ যখন মীমাংসা করতে পারলো না, তখন মিয়া সাহেব

রেগে উঠলেন। তিনি কোনদিন মেয়েলোকের উপর কথা বলেননি। আজ আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি জোর করে জিনিষ-পত্রের, গরু-ছাগলের সমান ভাগ করে দিয়ে নিয়ামতকে বললেন—তার পাওনা অর্ধেক ঘরে তুলতে। মিয়া সাহেব গম্ভীর মেজাজে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরিছন আর কোন কথা বলতে সাহস করেনি। সে-ও জানে—মিয়া সাহেব একবার রেগে গেলে আর নিস্তার নেই। তাকে হয়তো মার ধোর করতে পারবেন না কিন্তু সমস্ত রাগ তার স্বামী বেচারার উপর দিয়ে মিটিয়ে নিবেন। তাই, সে মিথ্যে আক্রোশে বসে বসে ফুলতে লাগলো। সেই ভাগাভাগির দিন থেকে কয়েক মাস সে সখিনাদের সাথে কথা বলেনি। সখিনা রাগ করেনি; সে প্রায়ই জা'র কাছে যেত—কথা বলতো, সংসারের কাজে অনেক পরামর্শ চেত; কিন্তু পরিছন কোনদিন কথা বলেনি। বরং সখিনাকে সামনে দেখলে তার কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়তো। সখিনা তার হাত ধরে কত কাকুতি মিনতি করতো! বলতো—আমার 'পরে এতো রাগ কর কেন বু!' আমি কি অন্যায় করেছি? পরিছন এক ঝামটা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলতো—যাও, যাও—অতো দরদ দেখাতে হবে না।

কয়েক মাস পর আবার কথাবার্তা চললো। জিনিষ পত্তর আদান-প্রদান চলতে লাগলো। তারপর সে কথাবার্তা ঘনিষ্ঠ থেকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। হাসি-ঠাট্টা, তামাসা আরও কত চলতে লাগলো।

পরিছন একেবারে সখিনার গা ঘেসে দাঁড়ালো। বেশ কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে ফেললো। বললো—তাইতো যে, এবার কাজ হয়েছে। বলি, ও ছোট ভাই! মিষ্টি খাওয়াচ্ছো কবে?—পরিছন নিয়ামতকে লক্ষ্য করে কথাটা বললো। নিয়ামত বললো—তা' ভাবী, আমার কাছে মিষ্টি খেতে চাচ্ছো কেন—ওই ওনার কাছে চাও, আমায় দেখে তো আর তুমি কিছু বুঝতে পারছো না। পরিছন হাত নাড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বললো—ও কথা বলে এড়িয়ে গেলে হবে না ভাই, কবে খেতে দিচ্ছ, তাই বলো।

নিয়ামত বললো—তুমি যদি নাইবা শুনতে চাও, তবে সবুর কর; ধান পাট উঠুক, হাতে টাকা পয়সা আসুক, তখন যত পার—পেট পুরে মিষ্টি খাওয়াবো।

পরিছন সখিনার চিবুকে হাত দিয়ে একটি নাড়া দিয়ে বললো—শুন্‌লিতো! আমায় নাকি একদিন পেটপুরে মিষ্টি খাওয়াবে। সখিনা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। পরিছন একটানে আঁচলটা খুলে ফেলে বললো— অতো লজ্জা করলে শুন্‌ছিনে—হ্যাঁ, সাক্ষী রইলি কিন্তু, তখন যেন আবার ভুলে যাস্‌নে। আর দোয়া করি, বেঁচে থাকো— আল্লাহ্‌ একটা চাঁদের মত ছেলে দিক, ঘর আলো হোক, সংসারে সুখ শান্তি আসুক। পরিছন ওদের জন্যে একটু দোয়া করে এক চামচ লবন হাওলাদ করে নিয়ে চলে গেল।

সখিনাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সে অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে আছে। তার অনেক কাজ পড়ে আছে, সে সব কাজ সারতে হবে, পানি তুলতে হবে; আবার রাতের জন্যে রান্না-বান্না করতে হবে। নিয়ামতও বিছেন ছেড়ে একরাশ আলস্য ঝেড়ে গরুর বিচালী কাটতে চলে গেল।

॥ ৭ ॥

সকালে মিয়া সাহেব এসে ডাক দিলেন—ও নিয়ামত!

নিয়ামত তখনও শুয়ে। ডাক শুনে হুড়মুড় করে উঠে বসলো। দু'হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললো—কি বলছো, বড় ভাই?

—আজ তোদের গাঁতা কার?

—কেন?

—আমারে আজ দিতে পারবি?

—ভুঁই নরম না। এখনও জো হয়েছে?

—জো হবে না! আমায় যেমন তেমন লোক মনে করেছিস্ নাকি! সব রকম জমি আমার আছে। পানি হয়েছে, তাই বলে কাজ বন্ধ থাকবে, আমার কাছে সেটি হবার যো' নেই। আজ দিতে পারবি?

—কাল তো গাঁতা বইনি, আজও হয়তো ব'বে না। পালামত আজ গাঁতা হয় নছর চাচার। তা' তার তো সে রকম জমি দেখছিনে যে, নিড়ান যাবে।

—তোর গাঁতা কবে?

—নছর চাচার পরেই।

—তা' আজ বলে কয়ে দেখ—এওয়াজ ফের করে নিতে পারিস কি-না!

—তুমি ক'নে নিড়াবা বড় ভাই?

পুকুরের পূবের পাড়ের প্যাট নিড়াব। এতদিন তাত গেল, জমি খুব কড়া হয়ে গেল—তাই, নিড়াইনি। ভোরে দেখে এলাম বেশ পরিষ্কার জো' হয়েছে, আজ দিতে পারলে ভাল হয়।

—তুমি আগুন তামাক নিয়ে যেও। আমি ওদের বলে আসি।

মিয়া সাহেব বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। নিয়ামতও বিছেন ছেড়ে উঠে পড়লো। একটা বিড়ি ধরিয়ে পাড়ার দিকে চলে গেল। গাঁতায় ছ'জন লোক। সকলের আবার বলতে হবে তো!

মিয়া সাহেব একটু দেরী করেই আগুন তামাক নিয়ে মাঠে গেলেন। যেয়ে দেখেন, নিয়ামতদের একখানা পাই উঠে গেছে। তারা কি বলাবলি

করছিল, মিয়া সাহেবের যেতে দেখে সবায় চুপ মারলো। মিয়া সাহেব বড় কঠিন লোক। তিনি বাজে কথাবার্তা মোটেও পছন্দ করেন না। কাজের কথা বলো—তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবেন। যে ভাল কথা বলবে, তাকে তিনি ভালবাসবেন। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করবেন। আর যে বাজে বকাবকি করবে তাকে তিনি দু'চোখে দেখতে পারেন না। তাকে আচ্ছা করে ধমক দেন, আর এমনভাবে বাজে বকতে নিষেধ করেন। তাই পাঁচজনে যখন এক যায়গায় বসে পাঁচ কথা বলাবলি করে, তখন মিয়া সাহেব সেখানে যদি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে, তা'হলে সবায় বোবা বনে যায়। কেউ আর একটি কথাও বলে না। গ্রামে অনেক লোক আছে—সন্ধ্যেবেলায় কারও বাড়ী বসে আড্ডা দেয়, তাস খেলা খেলে, যা' ইচ্ছে তাই করে। তারা অবৈধ কাজ যা' করে, তা' গোপনে চুরি করেই করে। হয়তো কতক লোক মিলে তাস খেলছে, মিয়া সাহেব হয়তো সেই পথে এসে পড়েছে ; আর যায় কোথা! মিয়া সাহেবের সাড়া পেয়ে চোখের পলকে কে যে কোথায় গেয়ে লুকোবে, আর খুঁজে বের করা যাবে না। মিয়া সাহেব বুঝতেই পারবেন না যে. এখানে কিছুক্ষণ আগে তাস খেলা হচ্ছিল। দৈবক্রমে কোনদিন যদি ঘটনা—স্থলে এসে পড়েন, তা'হলে আর উপায় নেই। তাসগুলো ছিড়ে কুটি কুটি করে ফেলবেন, আলোটা এক আঁছাড়ে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবেন। তারপর খেলোয়ারদের যা বোলচাল দিবেন, তা' শুনে কারও সাহস হবে না, একবার মাথা তুলে একটা কথা বলে।

মিয়া সাহেব বললেন—কেমন, ভাল জো' হয়েছে না?

—হ্যাঁ, খুব ভাল নিড়ুন লাগছে। ভাদলা ঘাসের মোতা পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে।

—আজকে নিড়িয়ে শেষ করতে পারবে তো?

—আল্লার মরজি যদি হয়, তা'হলে পারবো।

নিয়ামতের কথা শেষ হলেই মিয়া সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন—আরে আমার আল্লাওয়ালা লোকরে! নামাজ রোজার বালাই নেই, মুখে কেবল আল্লার নাম! কতবার বলেছি না—ওরে তোরা নামাজ পড়, রোজা রাখ—আল্লাহ খুশী হবে, তোদের অভাব দুর হবে। আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট না করতে পারলে কি রুজীতে বরকত হয়রে? পাগলের দল! আমি বলি, তোরা

এককান দিয়ে শুনিস আর এককান দিয়ে বের করে ফেলিস। সোজা কথায় তোরা পথে ফিরবিনে। সেদিন এক মৌলভী ঠিক করে ফেলেছি; আগামী শুক্রবার দিন আসবে। মৌলভীর মাসের বেতন, আলোর তৈল খরচ, আম-পারা কায়দা কেনা—সব খরচ আমি দেব, তোরা কেবল সন্ধ্যার পর পড়তে আসবি। সকালে কাজে বের হবি। সন্ধ্যের গোছল সেরে কাপড়-চোপড় পরে আমার দহলিজে চলে আসবি। বেশীক্ষণ রাত জাগতে হবে না। ঘণ্টা দেড়েক মাত্র পড়া লেখা করে যার যেই বাড়ী চলে যাবি। দেখি কে এবার এড়িয়ে যেতে পারে! যে আসবে না, তাকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে।

মিয়া সাহেব আরও দু' এক কথা বলে বাড়ী চলে গেলেন। নিয়ামত বললো—আসবা নাকি ভাই? মিয়া সাহেব বললেন—আমাকে একটু বাজারে যেতে হবে আর হয়তো আসা হবে না। তা' জিজ্ঞেস করছিস কেন, আর কিছু লাগবে নাকি?

—লাগবে না কিছু। বলছিলাম যে, কাল আর নেবা নাকি?

—কাল নেই—কি, না নেই, এখন বলতে পারবো না; সন্ধ্যের দিকে একবার আমার কাছে যাস, বলবো—কাল নেব কি, না।

মিয়া সাহেব চলে গেলে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো, এক সময় নছর কথা বললো—মিয়া সাহেব কিন্তু আমাদের ভালোর জন্যেই বল্‌ছে। তোরা সব আর অবহেলা করিস্‌নে। এ জীবন আর ক'দিনই বা! তাড়াতাড়ি নামাজ শিখে নে। এবার কিন্তু মিয়া সাহেবের কথা এড়িয়ে যেতে পারবিনে।

নিয়ামত বললো—মিয়া সাহেব প্রায়ই বলে—ওরে তোরা পথে আয়! মনে মনে একবার বলি—না, আর অবহেলা করবো না। এবার ধর্মের কাজ একটু করবো। কিন্তু সে-কি আর হবার যো'! শয়তান যে ঘাড়ে চড়ে রয়েছে। শয়তান কাঁধ থেকে নামাতে না পারলে, আর কাজ হবে না। মিয়া সাহেবের ধমক খেয়ে খেয়ে আর পারা যায় না।

নছর মণ্ডল বললো—তা'হলে এবার বোধ হয় গ্রামের সকলে ধর্ম পথে ফিরবে। আর না ফিরে বা যাবে কোথায়! মিয়া সাহেবও সোজা লোক নয়। তার কথা মত না চললে গ্রামে বাস করা মুশ্‌কিল হয়ে যাবে। আর

তার কথামত চলবে-বা না কে ? কেবল বুড়ো সর্দার ছাড়া আর সবায় শুনবে।

নিয়ামত বললো—সরদাররা শুনবে না কেন ? ওরে বাবা! বাদ দাও ওদের কথা। ওরা মানুষ তো না, যেন শয়তানের চেলা। ওদের বাইরে কেবল মানুষের খোলশ। দেখলে না ওরা কেমন গরীব ছিল। এই মিয়া সাহেবদের বাড়ীতে জন না খাট্‌লে ওদের পেটে দুটো দানা পানি পড়তো না। আর আজ দেখ, বেশ জমা জমি আর দু'পয়সা রোজগার করেছে। সব ফাঁকি! ফাঁকি দিয়ে উঠে গেছে। ওদের মুখে যেন মায়া জড়ানো। একবার তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দুটো কথা বলতে পারলে হয়; আর তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না। যে দিক থেকে হোক, তোমার কিছু খসিয়ে নেবেই। যখন নেবে, তখন তুমি বুঝতেই পারবে না। পরে যখন বুঝতে পারবে, তখন আর তোমার কিছু করবার থাকবে না।

লবা বললো—সে কথা তুমি বলছো নছর চাচা, এই দেখলে না—কেমন করে আমার কোলপাড়ার জমিটা নিয়ে নিল। এমনভাবে আমাকে ধোকা দিল যে, আমি মনে করলাম কত ভালোর জন্যেই না বলছে, শেষ পর্যন্ত নিজের পায়ে নিজে যে কুড়ুল মারলাম, তা বুঝবার আগেই কাজ সেরে নিয়ে বুড়ো সরদার সরে পড়েছে। ফাঁকি দিয়ে এতসব করছে। আল্লায় কি বরদাশ্‌ত করবে ? একদিন বুঝতে পারবে বাছাধন ধোকা দেওয়ার পরিণামটা কি!

নছর মণ্ডল বললো—বুঝবে না ? এমন ধোকাবাজ লোক কি আল্লায় পছন্দ করেন ? তিনি এ-সব লোকদের ঘৃণা করেন—। দুনিয়া যতদিন থাকবে, ততোদিন তিনি কিছু বলেন না। একদিন এর শাস্তি পাওনা রয়েছে। সেদিন আর ফাঁকি দিয়ে, ধোকা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

কথার ফাঁকে এক সময় দবির বললো—ওরে ও নিয়ামত ভাই! দু'খানা পাই উঠে গেল, এক সিলিম তামাক সাজো। নিয়ামত তার পাইতে বসে আইলের ঘাস মেরে নিরানীটা মাটিতে পুঁতে রেখে তামাক সাজলো। হুকোটা ডান হাতের তালুতে ধরে তার পাইয়ের মাথায় বসে বেশ কিছুক্ষণ গুর্‌ গুর্‌ করে টানলো। তারপর একটা লম্বা দম দিয়ে হুকোর মুখটা চোয়ালে মুছে পাশে নছর মণ্ডলের হাতে দিলে।

নছর মণ্ডল হুকোটা হাতে নিয়ে দু'একটা টান দিয়ে পূর্ব কথার জের টেনে বললো—আমাদের গ্রামে মানুষ বলতে এই মিয়া সাহেবকেই ধরা যায়। তা' মানুষ হবে না! যেমন ছিল তার বাপ, তেমন উঁনি। তিনিই হচ্ছেন আসল মিয়া সাহেব। বংশের যে পদবী তা' বাদ দিয়ে সকলে তাকে মিয়া সাহেব বলে ডাকতেন। একবার বরিশালের এক মৌলভী সাহেব তাঁর বাড়ীতে থাকতেন। তিনিই প্রথম তাঁকে মিয়া সাহেব বলে ডাকেন। সেই হতে তিনি মিয়া সাহেব হয়ে গেলেন। কোথায় নাম, আর কোথায় পদবী! সেই রকম জবরদস্ত লোক ছিলেন তিনি। তাঁর উপরে কথা বলার মত কোন লোক ছিল না পাঁচ গ্রামের মধ্যে। আর, ন্যায় কাজ ছাড়া অন্যায় কাজ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম এ সমস্ত অবৈধ কাজ তাঁর আমলে কেউ করতে পারেনি। একবার এই বুড়ো সরদার ও পাড়ার বিশের মা'র এক বিঘে জমি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নেয়। প্রথমে বিশের মা বুঝতে পারেনি। মূর্খ বিধবা; কিছুই বুঝতো না। তার একমাত্র সম্বল—বিশে আর কয়েক বিঘে জমি। এ-ছাড়া আর এ দুনিয়ায় তার কিছুই ছিল না। বিশের মা যখন জানতে পারলো যে, সরদার তার সর্বনাশ করেছে—তার একমাত্র ছেলে বিশেকে পথে বসিয়েছে, তখন সে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মিয়া সাহেবের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো। মিয়া সাহেব এ-কথা শুনে তো রেগে আগুন। তখনই তিনি সরদারকে ডেকে পাঠালেন। সরদারের মেঝে ভাই তো ভয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে চলে গেল। সে মরে যায় কয়েক বছর পর। সরদার আর কি করে! জড়সড় হয়ে মিয়া সাহেবের সামনে যেয়ে দাঁড়ালো। মিয়া সাহেবের ধমক খেয়ে আমির সরদার তখনই এক মজলিশ লোকের সামনে বিশের মা'র পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিল আর তার জমি ফিরিয়ে দিল। কেবল তা'হলেও হতো, পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করে মিয়া সাহেব বললেন—তোর টাকার গরম হয়েছে কেমন, তাই দেখে ছাড়বো। জরিমানার টাকা তখনই দিতে হল। তখনকার দিনে পঞ্চাশ টাকা সোজা নয়! কাছে ছিল না, এর কাছ থেকে, ওর কাছ থেকে হাওলাদ বরাদ করে টাকাটা মিয়া সাহেবের হাতে দিয়ে তবে ছাড়া পেল। তখনকার দিনে মেছের ছিল নাম-ডাক চোর। গ্রামে পাশের গ্রামে প্রায়ই চুরি হয়; অথচ, চোর ধরা পড়ে না। চুরি হয়,

আর মিয়া সাহেবের কাছে এসে সব হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। মিয়া সাহেব অনেক রকম চেষ্টা করে চুরি করা বন্ধ করতে পারেন না। এমনি হয়তো সবায় বুঝতে পারে—মেছের চুরি করেছে, কিন্তু হাতেনাতে না ধরতে পারলে তো আর আইনের মধ্যে ফেলা যায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি এক ব্যবস্থা করে ফেললেন এ-পাড়া ও-পাড়ার যে সব চরিত্রবান আর বিশ্বস্ত জোয়ান ছিল, তিনি তাদের নিয়ে একটা দল গঠন করলেন। অবশ্য এ দল গঠনের কথা বাইরের বেশী লোকে জানতো না। তারা গোপনে পাহারা দিত। হঠাৎ একদিন তাদের হাতে মেছের ধরা পড়লো। খালেক বিশ্বেসের ঘরের পিছন দিক থেকে মাটি কেঁটে ভিতরে ঢুকলো! ঢুকতে পারলো না। অর্দ্ধেক ঢুকেছে কেবল, পা দু'খানা বাইরের দিকে তখনও বেরিয়ে। আর যায় কোথা! আমরা নিকটেই ছিলাম, আস্তে আস্তে যেয়ে তার পা টেনে ধরলাম, বাছাধন আর যায় কোথা! ধরা দিতেই হলো। রাত তখন অর্ধেকেরও বেশী। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল— চোর ধরা পড়েছে। তাও আবার যে-সে চোর নয়—মেছের চোর! সেই রাতে গ্রামের লোক যেন ভেঙ্গে পড়লো—চোর ধরা দেখবে! আমরা মেছেরকে ধরে আর মোটেও দেরী করিনি, তখনই মিয়া সাহেবের কাছে নিয়ে গেলাম। হৈ চৈ শুনে তিনি বাড়ীর বাইরে এলেন—জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে তোদের? এতো হৈ-চৈ করছিস কেন?

—মেছের চোর ধরা পড়েছে।

—কার ঘরে চুরি করলো?

—খালেক বিশ্বাসের ঘরে।

মিয়া সাহেবের গঠন করা গ্রাম রক্ষা বাহিনীর নেতাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তোরা ধরলি নাকি?

—হ্যাঁ, চাচা।

—আমি জানতাম, আমার কথামত তোরা যদি চলতে পারিস—তা'হলে চোর বদমায়েস ধরা পড়বেই।

মিয়া সাহেব বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। রূপো দিয়ে বাঁধানো বেতের লাঠিটা নিয়ে আবার বেরিয়ে এলেন। তখন মিয়া সাহেবের আর এক মূর্তি। কার এমন বুকজোড়া সাহস আছে—তখন মিয়া সাহেবের চোখের দিকে চেয়ে

একটা কথা বলবে ? আমি ছিলাম দলের নেতা। মিয়া সাহেবের ইঙ্গিতে মেছেরকে পিঠ-মোড়া করে বেঁধে ফেললেন। তারপর তিনি ডান হাতের শক্ত তালুতে ধরা লাঠি দিয়ে মার আরম্ভ করলেন। বাব্বা! সে কি মার! তেমন মার এ গ্রামের কেউ জীবনে দেখেনি। সে কথা মনে উঠলে আজও গা শিউরে উঠে। মেছের যখন গোঙাতে শুরু করলো, তখন মার বন্ধ করলেন।

নিয়ামত জিজ্ঞেস করলো—তারপর কি করলেন ?

—আরে বলছি শোনো, অতো তাড়াতাড়ি করলে কথা শোনা যায় ?

নছর মণ্ডল বার কয়েক ঢোক গিলে আবার বলতে শুরু করলো—মার বন্ধ করে তিনি লাঠি নিয়ে বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। পরক্ষণেই আবার শুধু হাতে ফিরে এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে সকলে অবাক! এই কিছুক্ষণ আগে যার দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল, যে মুখ আষাঢ়ের ঘন মেঘের মত গম্ভীর ছিল—সেই চোখে-মুখে মুহূর্তের মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্তন! মুখে হাসি, দু'চোখে শান্ত দৃষ্টি। মিয়া সাহেব এগিয়ে এলেন। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—এমনিভাবে চিরদিন এই সব বদমায়েসদের অসৎ কাজ থেকে বিরত করতে নিজের জীবন উৎসর্গ কর। তিনি দলের অন্যান্য সবাইকে ডাকলেন। সকলে তাঁর চার পাশে এসে দাঁড়ালো। তিনি সকলকে আশীর্বাদ দিলেন। তারপর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন—আমি সবাইকে বহুবার বলেছি এবং এখনও বলছি—তোমরা সকলে সাবধান হয়ে যাও। যারা এতোদিন অন্যায় কাজ করেছে, তারা যেন আর সে পথে যেও না ; সৎপথে উঠে এসো। আর যারা ভাল মানুষ, তারা তো চিরদিনই ভাল। তবে হ্যাঁ, কেবল ভাল হয়ে থাকলে চলবে না। ভাল মানুষ হতে হলে অনেক কাজ করতে হবে। কেউ কোন রকম অন্যায় কাজ করতে পারবে না ; কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখলে বরদাশত করবে না। তখনই তাকে শাস্তির ব্যবস্থা করে ফেলবে। তোমরা সকলে মানুষের মত মানুষ হয়ে যাও। আমি তো' আর চিরদিন বেঁচে থাকবো না। আজ হয়তো আমাকে ভয় করে তোমরা অন্যায় কাজ থেকে বিরত হচ্ছো। আমি যখন মরে যাব, তখন আবার সব ভুলে যেয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে অনেক কিছু করতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু এ-কথা তোমরা জেনে রাখ—

আমাকে তোমাদের ভয় করবার কোন প্রয়োজন নেই, উপরওয়ালাকে ভয় কর। কেননা, মানুষ মানুষকে ভয় করবে—এ কোন নীতি নয়। স্রষ্টাকে ভয় কর। কেননা, যাকে তোমরা ভয় করছো, সে মরে যাবে। অতএব মানুষকে ভয় করলে তাকে ফাঁকি দেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু উপরওয়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যাচ্ছে না। কেননা, তিনি চিরন্তন। এই যে মেছের চোর, এর কথাই ধর—চিরদিন চুরি করেই কাটিয়েছে, কিন্তু চুরি করে সে কি করতে পেরেছে? একখানা বাড়ী তৈরী করতে পেরেছে—না, জমিদারী কিনতে পেরেছে? কিছু পারেনি, আর কোনদিন পারবেও না। কেননা, অসৎ পথে আয় করলে অসৎ পথেই ব্যয় হয়ে যায়। যে পথে আসবে, সেই পথেই চলে যাবে। কঠোর পরিশ্রম না করলে পরিশ্রমের বদলে যেটা পাওয়া যায়, তার প্রতি ভক্তি থাকে না। তাই সকলকে আমি আবার বলছি, তোমরা সবে খেটে খাও আর অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। সংসারে বাস করে কেবল নিজের স্বার্থ দেখলে চলবে না, দেশ ও দশের স্বার্থ দেখতে হবে। এই মেছের চুরি করে খায়। চুরি করা তার পেশা এবং নেশা দু'-ই। কিন্তু কোনদিন ওকে কেউ ধরতে পারেনি। আজ কেন ধরা পড়লো, জানো? এই সব নওজোয়ান-দের নিয়ে আমি তোমাদের না জানিয়ে একটি গোপন দল গঠন করেছিলাম, তাদের হাতেই ও ধরা পড়লো।

॥ ৮ ॥

দু'খানা পাই তুলে আবার তামাক সাজলো নিয়ামত। নিজে কয়েক টান দিয়ে হুকোটা এগিয়ে দিল নছর মণ্ডলের দিকে। বললো—ন্যাও, চাচা! বকতে বকতে তোমার মুখ দিয়ে থু থু বেরুচ্ছে। একটা দম দিয়ে ফেল। হুকোটা হাতে নিয়ে মুখটা হাতের মাস্থলে ঘষে নিল। কয়েকটা টান দিয়ে একটা লম্বা দম দিয়ে খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে হুকোটা বাড়িয়ে দিল পাশে লবার দিকে। কাশতে কাশতে একবার গলা ঝাড়া দিয়ে থু থু ফেলে বললো—হ্যাঁ, শালার কাশির চোটে কি আর কিছু বলতে ভাল লাগে, না কিছু খেতে ভাল লাগে। তামাক টানলেই কাশি লাগে। মনে করি—আর খাবো না, কিন্তু শালার নেশায় মেরেছে। নেশাটা যে কি, তা' বুঝতে পারলাম না। কেমন যেন আপনই মনের মধ্যে এসে যায়।

লবা বললো—ও নছর চাচা! ও-সব কথা বাদ দিয়ে যে কথা হচ্ছিল, তাই বল না?

—ওরে আস্তে শোন। মাঝে মাঝে একটু ঢোক গিলতে দে।

নছর মণ্ডল আবার আরম্ভ করলো—মিয়া সাহেব আরও অনেক কথা আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা সব বাড়ী যাও। সব খাটুনীর শরীর। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো, একটু বিশ্রাম ন্যাওগে। সকালে আবার কাজে বেরুতে হবে তো!

নিয়ামত জিজ্ঞেস করলো—তোমরা সেই দলে ছিলে নাকি চাচা?

—হ্যাঁ।

—তা'হলে তোমরা যা' হোক দু'টো একটা ভাল কাজ করেছো। আমরা গো-মূর্খের দল সব, দুনিয়ায় আইছি কেবল খেতে পরতে; আর কিছু আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

দবির বললো—তোমার অতো বক্তিমে করতে হবে না, নিয়ামত। পেটে ভাত না থাকলে কেউ কি কিছু করতে পারে, না কারও সাহায্য করতে পারে? তা থাক চাচা! তুমি যা' বলছিলে—তাই বল।

—তারপর আমরা সব বাড়ী চলে গেলাম।

—মেছের চোরের কি করলো?

অনেকে শেষে বললো—ওরে যে মার মারা হয়েছে, ও যদি বেঁচে থাকে—তা'হলে কোনদিন আর এ কাজ করবে না। ওকে আর বেঁধে চালান না দিয়ে ছেড়ে দেন।

মিয়া সাহেব বললেন—তোমরা সব ছেলে মানুষ। তেমন বুদ্ধি-জ্ঞান এখনও হয়নি। ওকে ছেড়ে দিলে আমাদের অন্যায় করা হবে। কেননা, আমাদের সরকারকে অমান্য করা হয়। দেশে আইন আছে। আইন মেনে না চললে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়। চোর ডাকাত আমরা ধরতে পারি, কিন্তু তার শাস্তি দেওয়ার মালিক সরকার। আমাদের ইসলামের নীতিতে যেমন আছে—আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াই পাঠিয়েছেন তাঁর গুণগান করবার জন্যে। আল্লাহ্ কোরান পাঠিয়েছেন, আর রসুল পাঠিয়েছেন। কোরান হল—আইন বই, আর রসুল হচ্ছেন আইন ব্যাখ্যাকারী। তাঁর আইন অমান্যকারীদের জন্যে রয়েছে দোজখ, আর মান্যকারীদের জন্যে রয়েছে বেহ্শত। একদিকে শাস্তি—অপর দিকে শান্তি। তিনি হচ্ছেন দীন দুনিয়ার মালিক—আর সরকার হচ্ছেন কেবল মাত্র সীমাবদ্ধ এলাকার মালিক। তাই দোষীর বিচার করবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। দেশের সরকারকে অমান্য করে বৃহত্তর কোন কাজে জয়লাভ করা যায় না। তবে হ্যাঁ, দেশের সরকার যে অন্যায় কিছু করতে পারে না, সেটা ভুল ধারণা। যদি করে থাকে এবং করতে থাকে, তার জন্যে তো আমরা রয়েছি। আমরা অন্যায় করলে যেমন তিনি শাস্তি দিতে পারেন, তেমন তিনি অন্যায় করলে তাঁর শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ সর্বে-সর্বা। তিনি যে আইন করেছেন, তার বিরুদ্ধে কারও কিছু করবার বা বলবার নেই। কেননা, সেই আইন মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের স্বার্থের জন্যে তৈরী হয়নি। তাঁর সৃষ্টির সব কিছুর ভালোর জন্যে তিনি আইন প্রণয়ন করেছেন। মানুষ নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যে অনেক কিছু করতে পারে, করবার

জন্যে কেউ নিষেধ করছে না, তবে ন্যায় অন্যায় দেখতে হবে। পাপ-পুণ্যের বিচার-কর্তা যেমন আল্লাহ, তেমন দেশের সরকার হচ্ছেন দুনিয়ার চলার পথে মানুষ যে সাময়িক সময়ের জন্যে অনেক অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়—তার বিচার ও শাস্তির মালিক। পরস্পরের সহযোগিতা না হ'লে দেশকে অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই মেছের চোরকে আমি মেরেছি গ্রামের সমাজ নষ্ট করবার অপরাধে। ওর কেবল ঐ একটি অপরাধই নয়। দ্বিতীয় অপরাধ হচ্ছে চুরি করা। তার শাস্তি সরকারের হাতে। অতএব, ওকে এখন আইনের হাতে তুলে দিতে হবে।

মিয়া সাহেব তখনই চৌকিদার এবং দলের নেতাকে আরও দু'একজন সঙ্গে নিয়ে মেছেরকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন। সেই দিনই রাতে তিনি গ্রামের সব লোককে তার বাড়ীতে ডাকলেন। সকলে এলে তিনি তাদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে একটা শক্তিশালি দল গঠন করলেন। দলটাকে সাতটা ভাগ করলেন। সাতটা দলের সাতজন মাতব্বর থাকলো। তিনি নিজে হলেন দলের প্রধান পরিচালক—বিচারক। তাই বলে রাত জেগে সকলকে ঘুরে বেড়াতে হত না ; সন্দেহ হলে এবং কোন গোপনীয় সংবাদ পেলে রাতে কয়েক-জনকে মিলে ডিউটি দিতে হত।

নিয়ামত জিজ্ঞেস করলো—সব দিন যদি ডিউটি না দিতে হ'ত, ত'াহলে দল গঠন করবার মানেই বা কি, আর সাতটা ভাগ করবারই বা দরকার কি ?

আরে বাবা, তোমরা তো ছেলে মানুষ। সেই বুদ্ধি তোমরা কোথায় পাবে ? আমরাই আগে বুঝতে পারিনি—এর দরকার কি। মিয়া সাহেব বুঝিয়ে দিলেন—আমি যে দল গঠন করলাম এবং সাতটা ভাগে ভাগ করলাম, তার কারণ হচ্ছে—আমি চাই, আমার গ্রামের প্রতিটি মানুষ সত্যের পথে চলুক। যত মিথ্যা, অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক। এক একটা গ্রুপের একজন মাতব্বর নিযুক্ত করা হল ; কারণ, ছোট খাট কোন কিছু হলে তাকেই জানাতে হবে। যেমন ধরো—একজন কোথা থেকে বাড়ী আসছে, দেখলো—তার গ্রামের সীমানায় একজন ভিন যায়গার লোক হা-হুতাশ করছে ; সে কোথায় যাচ্ছিল বা কোথা থেকে বাড়ীর পথে ফিরছিল—পথিমধ্যে তার সবকিছু কে বা কাহারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, গ্রামের যে লোকটির সামনে এই

বিপদগ্রস্থ লোকটি পড়লো, সে তখনই তাকে সঙ্গে নিয়ে তার গ্রুপের মাতব্বরের কাছে নিয়ে যাবে। মাতব্বর অর্থাৎ গ্রুপ কমাণ্ডার তাদের নিয়ে পুরো দলের প্রধান পরিচালকের কাছে নিয়ে আসবে। তিনি তখনই একটি জরুরী মিটিং ডাকবেন। যদি গ্রামের কোন ব্যক্তি ঐ লোকটির টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে থাকে, তা'হলে তখনই তা' ফেরৎ দিতে হবে। আর নেওয়ার শাস্তি স্বরূপ এ পার্টির ফাণ্ডের জন্যে অপরাধ হিসাবে জরিমানা করা হবে। আর সন্ধানে যদি জানা যায় যে, আসামী বাইরের গ্রামের কেউ, তা'হলে দলের প্রধান মাতব্বর তার দলের গ্রুপ কমাণ্ডারদের নিয়ে সেই গ্রামের মোড়লের কাছে যাবেন। তাঁর সাথে পরামর্শ করে আসামী ধরবার ব্যবস্থা করবেন। আর যদি গ্রামে কিংবা বাহির গ্রামে কে আসামী তা' জানা না যায়, তা'হলে বিপদ-গ্রস্থ লোকটিকে পার্টির ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা পয়সা পথ খরচের জন্যে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে।

গ্রামে কারও বাড়ীতে—তা' সে গরীব হোক আর মহৎ হোক, কেউ যদি কঠিন রোগে পড়ে, তা'হলে সেই এরিয়ার গ্রুপ কমাণ্ডার যেখানে যাকে রাখা সম্ভব, তাকে সেই রোগীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য রাখবে। একটি সময় নির্ধারিত করে দিতে হবে। হয়তো দু'জন দু'ঘণ্টা থাকলো ; তারা চলে গেলে আর দু'জন এলো। এমনিভাবে যার সেই এরিয়ার মধ্যে কাজে লেগে থাকলে কারও বেশী পরিশ্রম হবে না এবং রোগীও বেশী কষ্ট পাবে না।

গ্রামে হয়তো এমন লোকও আছে, সংসারে হয়তো তার কাজের মানুষ কেউ নেই সে বৃদ্ধ কি-বা বৃদ্ধা কোন রকম কষ্টে স্বষ্টে চলাফেরা করে বেড়ায় আর ভিক্ষে করে খায়। তখনই গ্রুপ কমাণ্ডারদের কর্তব্য সেই নিঃসহায় লোকটির সহায় হওয়া ; তার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা। দরকার হলে তার কিছু কাজ করে দেওয়া। গ্রামের ভিতরে ভিক্ষুক থাকলে গ্রামের সম্মান নষ্ট হয়। যারা ভিক্ষে করে খায়, তা'দের মধ্যে যারা যে কাজই করতে পারুক সেই কাজের ব্যবস্থা তখনই গ্রুফ কমাণ্ডাররা করে দেবে। আর তাদের মধ্যে যারা একেবারেই অক্ষম, তাদের কিছু চাঁদা সংগ্রহ করে কিছু পার্টির ফাণ্ড থেকে সাহায্য করতে হবে।

গ্রামের মধ্যে কোন অন্যায়, অত্যাচার চলবে না। যদি কোন কারণে গ্রামের মধ্যে কারও সাথে কারও মারামারি বা ঝগড়া-ফ্যাসাদ এবং জমাজমি নিয়ে, ছেলে-মেয়ে নিয়ে কোন রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে থাকে, তা'হলে তার প্রাথমিক বিচার হবে এই গ্রামে। এই যে দল বা সঙ্ঘ গঠন করা হ'ল, এরাই তার বিচার করবে। এখানে বিচার না করে কেউ কোর্ট-কাছারীতে মামলা-মোকর্দমা করতে পারবে না। যদি কেউ এই আইন অমান্য করে, তাকে কঠিন সাজা দেওয়া হবে এবং সামাজের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

বেলা দুপুর হয়ে গেছে; সকলের বাড়ী যাওয়ার সময়ও হয়ে গেছে! আর মাত্র একখানা পাই নিড়াতে বাকি। নিয়ামত বললো—এই একখানা পাই রেখে গেলে মিয়া সাহেব কি বলবে! লবা বললো—মিয়া সাহেব আর কি বলবেন! তিনি নিয়মের বাইরে কোনদিন যান্‌নি। আমরা কত দেখলাম—মিয়া সাহেব যদি ক্ষেতে উপস্থিত থাকেন, আর সময় যদি হয়ে যায়, তা'হলে একখানা পাই কেন, হাত দশ-বারোও যদি নিড়াতে বাকি থাকে, তবু তিনি বলবেন—যা, তোরা বাড়ী যা, সময় হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, আমরাই বা কি লজ্জায় সেটুকু রেখে আসতে পারি। মানুষ যদি থাকে, তবে এই মিয়া সাহেবদের বংশে! বুড়ো মিয়া সাহেবের কথা তো নছর চাচার কাছে শুনছি, আবার এই মিয়া সাহেবকে তো আমরা ছোট থেকে দেখে আসছি, এমন মানুষ দুনিয়ায় খুব কমই আছে। এই সব লোকের বাড়ী কাজ করে সুখ আছে। কাজ করায় বুড়ো সরদার। জমির অর্ধেক এখনও বাকি রয়েছে; সময় হয়ে গেলেও বলবে, তাড়াতাড়ি নিড়ো ভুঁই শেষ করে দিয়ে যাবি। যেমন আমাদের ঠকায়, তেমন মিয়া সাহেবের কাছে গাল-মন্দও শোনে। তবে কি বলবোরে ভাই। গাল-মন্দ শুনে শুনে ওদের কানে মরচে ধরে গেছে, তাই ও-সব শুনতে ভয় করে না।

নছর মণ্ডল বললো—বাদ দাও ওদের কথা, অন্যায় করে মিয়া সাহেবের কাছে কান ধরে নাকে খত দিয়ে অপরাধের শাস্তি মেনে, আবার ফিরে এসে ঠিক সেই পথেই যাবে। আরে বাবা—বলবো কি, যে গরু 'গু' খায়, তার মুখে ঠুসি লাগালেও সে শোনে না; ঠুসি মুখে চাটবে। এরাও ঐ রকম।

ওদের বংশের সবই ঐ রকম। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি ঐ সরদারদের এই মিয়া সাহেবের বাড়ীতে জন খাটতে। বুড়ো মিয়া সাহেব যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর ছেলে ছোট ছিল; তাই সেই সুযোগে ওরা অনেক কিছু করে ফেলেছে। সব পাপের ধন। ক'দিন পারবে ভোগ করতে! দেখ, একদিন নিশ্চয় ধ্বংশ হয়ে যাবে। কই, বাছাধনেরা খুব করে নিয়েছে; কিন্তু এখনতো আর করতে পারছে না। বাঘের বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, তার সামনে আর জুয়োচুরি খাটবে না। শোননি, বিশের মাকে ফাঁকি দিয়ে মিয়া সাহেবের কাছে কি শাস্তি পেল!

শেষ পাইখানা তুলে সকলে বাড়ী চলে গেল! নিয়ামত হুকো টানতে টানতে মিয়া সাহেবের পুকুর-ধারে তার গরু দু'টি বাঁধা ছিল, সে দু'টো সরিয়ে দিল। যাবার সময় মিয়া সাহেবের বাড়ীর দিক থেকে ঘুরে গেল। জমি নিড়ানো শেষ হয়ে গেছে, এই সংবাদটা তাকে দেবার জন্য সে এই পথে এলো। খামার থেকে বার কয়েক ডাকবার পর মিয়া সাহেবের ছেলে বেরিয়ে এসে বললে—আব্বা বাড়ীতে নেই। তখন নিয়ামতের হঠাৎ খেয়াল হলো—তাইতো, মিয়া সাহেব যে বলছিল, বাজারে যাবে; নিশ্চয় সেখানে গেছে। নিয়ামত আর দেরী না করে বাড়ীর দিকে গেল। বাড়ীর সামনে আমতলায় এসে তাকিয়ে দেখলো, তার ঘরের হাতনেয় কারা যেন শুয়ে রয়েছে। তফাৎ থেকে বুঝতে পারলো না—কা'রা। সে আর সামনে দিয়ে এলো না! কুয়োর পাড় ঘুরে গোয়াল ঘরের পিছন দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। যেয়ে দেখে—সখিনা মুরগীর ডিম ভাজছে।

নিয়ামত যেন কিছু জানে না—এমনভাবে বললো—ব্যপার কি, ডিম ভাজা হচ্ছে যে! নিয়ামতের রান্নাঘরে উপস্থিতি সখিনা বুঝতে পারেনি। কথা শুনে সে পিছন দিকে তাকিয়ে হাসলো।

—মুখে আজকে যে বড় হাসি দেখছি! বাপের বাড়ীর কেউ আসছে নাকি?

—কেন, হাতনেয় শুয়ে রয়েছে—তুমি দেখনি?

—না-তো! কে এসেছে?

—বড় ভাই আর বড় ভাইয়ের শালা।

—তাই নাকি! তাইতে বুঝি তোমার এত হাসি হাসি ভাব!

—হ্যাঁ, তাই !—সখিনা কৃত্রিম রাগের সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

নিয়ামত টুকাটা রান্নাঘরের এক কোণে রেখে হুকোটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বললো—রাগ করেছো ?

সখিনা মুখ বুজে চামচ দিয়ে কড়াই থেকে ডিম ভাঁজি তুলছিল। কোন উত্তর না পেয়ে নিয়ামত পিছনে যেয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখ উঁচু করে ধরে বললো—কি হ'ল, কথা বলছো না কেন! রাগ করেছো ?

সখিনা স্বামীর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। বললো—আমি কি তোমার উপর রাগ করতে পারি! যাও, চ্যান করে এসো। আমার ভাত-তরকারি হয়ে গেছে।

নিয়ামত তেলের পলাটা বাম হাতের তালুতে উপুর করে হাতখানা মাথায় ঘষতে ঘষতে পুকুরের দিকে গেল।

সখিনা বাটা-ঘটি ধুয়ে, পরিষ্কার করে সব ঢেকে ঢুকে রেখে, হাতনেয় যেয়ে তার ভাইকে ডাকলো। দু'বদনা পানি নিয়ে এসে বললো—হাত মুখ ধুয়ে বসো, আমি ভাত নিয়ে আসছি।

বড় ভাই আমজাদ জিজ্ঞেস করলো—নিয়ামত এখনও বাড়ী আসেনি ?

—এসেছে, চ্যান করতে গেছে।

সখিনা একটা গামলায় ভাত বাড়লো। দু'টি বাটিতে দু' ভাগের তরকারি বাড়লো, লবনের বয়েমটা ন্যাতা দিয়ে মুছে পরিষ্কার করলো, একটি ছোট বাটিতে ডিম ভাজি রাখলো। সব গোছানো হয়ে গেলে একটা একটা করে হাতনেয় নিয়ে এলো। নিয়ামত গোছল সেরে কাপড় বদলিয়ে হাতনেয় এসে দাঁড়ালো, ওদের ছালাম জানিয়ে বাড়ীর কুশল জিজ্ঞেস করলো। আমজাদ সব কুশল জানিয়ে ঘুরে ঠিক হয়ে বসলো। নিয়ামতও তাদের সাথে খেতে বসলো। সখিনা চামচে করে গামলার ভাত বাটির তরকারি বাসনে দিতে লাগলো। খেতে খেতে আমজাদ জিজ্ঞেস করলো—ধান, পাট কেমন হয়েছে, নিয়ামত ?

নিয়ামত মুখের ভাত চিবিয়ে একটা ঢোক গিলে বললো—তাতে সব মরে যাচ্ছিল, তা' আল্লাহ পানি দিয়ে সব বাঁচিয়েছেন। তা' যেমন দেখা যাচ্ছে—আশা করছি—এবার ফসল খুব ভাল হবে, এখন সব আল্লার হাতে। তা' আপনাদের কেমন হয়েছে, বড় ভাই ?

—আমাদেরও ভাল হয়েছে। তুমি যা' বলেছ—সব খোদার হাতে। তবে পরিশ্রম করে যেতে হবে, দেনেওয়ালা তিনি।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সখিনা থালা-বাটি, গামলা সব রান্নাঘরে নিয়ে গেল। সেগুলো ঢেকে ঢুকে রেখে ঘরে এসে পান সাজতে বসলো। তিন জনের তিনটা পানের খিলি বানিয়ে পানের বাটায় করে তাদের সামনে দিয়ে নীচে নেমে গেল। হুকোর পানি বদলিয়ে কলকেয় তামাক আগুন দিয়ে স্বামীর হাতে দিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল। এতো থালা বাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে খেতে বসলো।

নিয়ামত বিছেন, খ্যাতা ঠিক করে দিয়ে বললো—নিন্ ভাই! শুয়ে পড়ুন। সে নিজেও একটি বালিশ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো। সমস্ত দিন পরিশ্রম, তারপর আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বচ্ছে। ক্লান্ত শরীর আপনই এলিয়ে পড়লো, নিয়ামত শুয়ে পড়ে চোখ বুজলো। হঠাৎ তার মনে হল, তাইতো! বাড়ীতে তরি-তরকারি, মাছ কিছু নেই। ভাইরে এসেছেন, এখন না হয় কোন রকম খেতে দিল। রাতেই বা কি খেতে দেবে; ঘুমুলে তো চলবে না। রাতের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। হাতে একটা পয়সা কড়িও নেই। কি নিয়েই বা বাজারে যাব।

নিয়ামত চোখ বুজে অনেক চিন্তা করে কিছু স্থির করতে পারলো না। শেষে উঠে রান্না ঘরে সখিনার কাছে গেল। সখিনা তখন ভাত খাচ্ছে? স্বামীকে রান্না ঘরে দেখে জিজ্ঞেস করলো—একটু ঘুমুলে না?

—ঘুম আসছিল, কিন্তু ঘুমুতে পারলাম কই!

—কেন?

—তোমার ভাইরে অনেকদিন পরে এসেছেন, দুপুরে খেতে দিলে যোগেযাগে, রাতেই বা কি খেতে দেবে! একটু মাছ মাংস না হলে ওরা কি মনে করবেন!

—সে চিন্তা তোমার করতে হবে না, আমার ভাই কিছু মনে করবার মত লোক না!

—আরে তোমার ভাইয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু উনি! উনি তো এই নতুন এসেছেন। উনার জন্য তো কিছু ব্যবস্থা করবার দরকার।

আচ্ছা, যে হাঁসটা ডিমুলো হয়েছে, ওটা জবাই করলে হয় না ?

—ভাইয়ের কুটুম করিম ভাই হাঁসের গোস্ত খায় না ! দুপুরে জবাই করবো বলে কুয়ো থেকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে তুলে এনে ঢেকে রেখেছি। ভাইকে বললাম জবাই করে দিতে ; করিম ভাই বললো—আমি কিন্তু হাঁসের গোস্ত খাইনে। তাই, হাঁস জবাই করা হ'ল না। নিজেদের মোরগ-মুরগী না থাকলে, সব কি কিনে খেয়ে পারা যায় ! একঘর মোরগ-মুরগী হলো—সব ব্যায়রামে মরে গেল। কপালে নেয়, তা' হবে কেন !

একঘর কুক্‌ড়ো মড়ক লেগে মরে যাওয়াতে সখিনা বেশ কিছুক্ষণ দুঃখ করলো। নিয়ামত বললো—সে কথা এখন মনে করে কি লাভ হবে ! যা' গেছে, তা' গেছে; আবার পোষো, আবার ঘর ভরে যাবে ! তা' যাক, এখন কি করবো ! হাতে যে একটি পয়সাও নেই। কথাটা নিয়ামত আমতা আমতা করে বললো। কেননা, সে মনে করেছিল—তার এ-কথা শুনে সখিনা রেগে যাবে। বলবে—আজ তোমার হাতে পয়সা থাকবে কেন, আমার ভাই এসেছে যে ! অন্য দিন তো হাতে বেশ পয়সা থাকে ! কিন্তু সখিনা তেমন মেয়ে নয়। এমন কথা সে বলতে পারে না। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—আচ্ছা, মিয়া সাহেবের জন দিয়ে এলে, তার দামটা চেলে পাওয়া যাবে না ?

—তার জন দিয়ে এই কেবল বাড়ী এলাম ! এখন তার কাছে যেয়ে টাকা চাই কি করে ?

—কেন, তোমার এতো ভয় কিসের ? উনি তো সরদারদের মত নন যে, পনেরো দিন ঘুরিয়ে তবে টাকা দেবেন। যেয়ে দেখ, চাইলে দিয়ে দেবেন।

—মিয়া সাহেব বাড়ীতে নেই।

—কোথায় গেছেন ?

—বাজারে যাওয়ার কথা ছিল !

—তবে তুমি একটু পরে বাজারে যেয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিও।

—যদি দেখা না পাই ?

—তাও তো মন্দ কথা নয়। যেয়ে যদি না পাওয়া যায়, তা'হলে ব্যাকুল

হয়ে ফিরে আসতে হবে। আচ্ছা, তুমি একটু শোও যেয়ে, আমি ভাত দু'টো খেয়েনি।

—শুলেই ঘুম আসবে। ঘুমুলে কোন কাজ হবে না।

—না ঘুমিয়েও তুমি কিছু করতে পারবে না। আমি একবার মিয়া সাহেবদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি, দেখি কি হয়।

—বাড়ী নেই, যেয়ে কি লাভ হবে?

—মাসুদা বু'র কাছে যেয়ে বলবো।

—দেখো, ওরা যেন আবার আমাদের উপর রাগ-টাগ করে না! ওরা ছাড়া আমাদের দেখবার মত আর কেউ নেই। মিয়া সাহেব যখন ছোট, তখন তার বাপ মরে যায়। সেই সুযোগে সরদাররা আমাদের ভাল ভাল জমি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নিয়েছে। কই, এখন তো নিতে পারছে না; পারছে না শুধু ঐ মিয়া সাহেবের জন্যে। মিয়া সাহেব যদি এতো তাড়াতাড়ি বুঝতে না শিখতো, তা' হ'লে সরদাররা এতোদিন একশো' বিঘে জমি করে ফেলতো। তুমি যেন ভাবীর সাথে বেশী কিছু বলতে যেয়ো না, মিয়া সাহেব শুনলে রাগ করবে।

—আরে, তুমি সে ভয় কর না। তুমি জানো না মাসুদা বু' কেমন মেয়ে। এমন মেয়ে পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা। যেমন মিয়া সাহেব, তেমন তার স্ত্রী।

সখিনা যখন মিয়া সাহেবের বাড়ীতে গেল, তখন মাসুদা বেগম খাটের উপর শুয়ে পান চিবুচ্ছিলেন। সখিনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে একবার ডাক দিল।

—কে?

—আমি, বু'।

—সখিনা!

—হ্যাঁ।

—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, এদিকে আয়।

পাড়ার যে বৌ-ই হোক, আর মেয়েই হোক, না বললে মিয়া সাহেবের ঘরের মধ্যে ঢুকতে সাহস করে না। কিন্তু মাসুদা বেগম তা' চান না। তিনি অন্তরে অন্তরে বুঝতে পারেন—ভয়ে কেউ তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে পারে না। তিনি সবার সাথে মেলা মেশা করে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চান। তিনি এখানে বৌ হয়ে এসেছেন আটটি বছর। একটি ছেলের মা তিনি!

তবু নিজেকে যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা মনে করেন। এই পরিবারটাই কেবল গ্রামের মধ্যে শিক্ষিত এবং সবার কাছে সম্মানিত। গ্রামের কথা দূরে থাক, প্রতিবেশীদের মধ্যে একটু অ-ক-খ জানা লোক নেই, ধর্ম-কর্ম করবার লোকও নেই। পুরুষদের মধ্যে তো নেই-ই ; তা'ছাড়া তাদের বৌ-ঝিরাও গণ্ডমূর্খ—কিছু জানে না। তিনি অনেকবার এই কথা চিন্তা করেছেন—এদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে চলবে না ; যে কোন উপায়েই হোক, এদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে হবে—এদের সত্য ও ন্যায়ের পথে এনে দাঁড় করাতে হবে। বহুবার তিনি এ-কথা চিন্তা করেছেন ; কিন্তু পারেন নি কেবল তাঁর অল্প বয়সের জন্যে। পাড়ায় অনেক বয়জ্যেষ্ঠা আছেন, তাঁরা বলেন—ছুঁড়ি কাল এসে আজ আমাদের উপর মাতব্বরি করতে চায়। মুখ ফুটে হয়তো কেউ বলতে পারে না, তবে অন্তরে অন্তরে যে বলে, তা' মিয়া-গিন্নী বেশ বুঝতে পারে !

সখিনা মাথা নীচু করে ঘরের মধ্যে যেয়ে দাঁড়ালো।

—কিছু বল্‌বি নাকি ?

—বল্‌ছিলাম কি, আমার ভাইয়েরা এসেছে, বাড়ীতে কিছু নেই। উনার হাতেও একটি পয়সা-কড়ি নেই। তাই বল্‌তে এসেছি ওঁরা আজ আপনাদের জন দিয়েছে, জনের দামটা পেলে ভাল হত।

—কখন এলো তোর ভাই ?

—দুপুরের আগে।

—খোকনের আব্বা বাড়ীতে নেই, আসবার সময় হয়ে গেছে ; একটু পরে আসিস।

—আপনার কাছে নেই ?

—আমি দিতে পারতাম, কিন্তু খোকনের আব্বা যাবার সময় ভুল করে বাক্সের চাবি নিয়ে গেছে। চাবি আমার কাছে থাকলে দিতে পারতাম। তুই একটু পরে নিয়ামতের পাঠিয়ে দিস, আমি বলে কয়ে দেব।

সখিনা মিয়া সাহেবদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে কেবল লেবুতলার কাছে এসেছে, এমন সময় তিনি সাইকেল চেপে বাড়ী এলেন! সখিনা আবার ফিরে যাবার জন্যে দাঁড়ালো! হঠাৎ মনে হল তিনি সকালে বাড়ী থেকে গেছেন। এখন স্নানাহার করবেন, একটু বিশ্রাম নেবেন; তবে তো টাকা দিবেন। এখন যদি সে যেয়ে টাকার কথা বলে, তা'হলে তিনি রাগ না করলেও মনে মনে নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হবেন। সে বাড়ীতে চলে গেল। দুর তো নয়, মাঝখানে মাত্র গোটা চারেক বাড়ী ছাড়াতে হয়। নিয়ামত তার অপেক্ষায় রান্না-ঘরের দরজার কাছে বসে তামাক টানছিল। সে উঠোনে পা দিতেই জিজ্ঞেস করলে—কি হল?

—মিয়া সাহেব এখন বাড়ী এলো। আর কিছুক্ষণ পরে তুমি যেও, আমি বু'র সাথে সব বলে এসেছি। তুমি গেলেই দিয়ে দেবে।

নিয়ামত এবার হুকোটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘরের হাতনের মেয়ে শুয়ে পড়লো। সখিনা রান্না-ঘরের অবশিষ্ট কাজটুকু সেরে ঘরের মধ্যে তক্তার উপর কাঁথা বিছিয়ে শিলাই করতে বসলো।

গরমের দিন। তাতে পুড়ে মানুষের শরীর যেন তামার মত হয়ে গেছে। গতকাল পানি হয়েছে, আজকেও আকাশটা মেঘে ঢেকে রয়েছে; তাই হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। নিয়ামত বিছানায় কাত হতেই ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম থেকে যখন সে জেগে উঠলো, তখন বেলা অনেক পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে পানি দিয়ে গামছা দিয়ে মুছ্‌তে মুছ্‌তে মিয়া সাহেবের বাড়ীর দিকে গেল। মিয়া সাহেব তখন বৈঠকখানায় বসে মাষ্টারের সাথে গল্প করছিলেন। নিয়ামত সেখানে যেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি গল্প সেরে বাইরে নেমে দেখেন—নিয়ামত দাঁড়িয়ে রয়েছে বৈঠকখানার খুটি হেলান দিয়ে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কিরে নিয়ামত! এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

নিয়ামত আমতা আমতা করে বললো—তোমার কাছে এসেছিলাম।

—কেন?

—বাড়ীতে কুটুম্ব এসেছে।

—কে এসেছে?

—আমার শালা!

—তাই, কি বলছিস্?

—বলছিলাম যে, জন দিলাম, তার···

—তার কি! টাকা নিবি?

—হ্যাঁ।

—তা অমন করে গ্যাঁ-গূ করছিস কেন? কাজ করেছিস, তার দাম নিবি—তার জন্যে ঢোক গিলে কথা বলছিস কেন? উপরে উঠে বস, আমি টাকা দিচ্ছি।

তিনি বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন। নিয়ামত উপরে উঠে মাষ্টার সাহেবের সাথে গল্পে মেতে গেল। কয়েক মিনিট বাদে তাঁদের বাড়ীর চাকর রশন পাঁচটা টাকা নিয়ে এসে নিয়ামতের হাতে দিল। নিয়ামত টাকা হাতে নিয়ে আর একটুও দাঁড়ালো না। দ্রুতপদে বাড়ী যেয়ে জামাটা কাঁধে ঝুলিয়ে চটের পকেটটা ভাজ করে বগলের তলে চেপে ধরে বাজারের দিকে গেলে।

নিয়ামত বাজারে চলে যাবার কিছুক্ষণ পর তার শালার ঘুম থেকে উঠে সখিনাকে ডাক দিল। সখিনা কাঁথা সিলাই করতে করতে কখন যেন আপনই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাইয়ের ডাকে ধড়্মড়্ করে উঠে দরজা ঠেলে বাইরে এলো। চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে দিয়ে বদনা দু'টো ধুয়ে দু'বদনা পানি ঢেলে হাতনের ডা'র কান্দায় রাখলো। তারা মুখ-চোখ ধুয়ে গামছায় মুছে উঠে দাঁড়ালো। সখিনাকে ঘরের মধ্যে থেকে জামা দু'টো বের করে দিতে বললো।

—এখন জামা কি করবে?

—বাড়ী যাব।

—ওমা, সে কি!—সখিনা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

—থাকবার বড় অসুবিধা।

—হ্যাঁ, আমার বাড়ী এলে তো তোমাদের থাকবার অসুবিধে হবেই। আমি গরীব, তোমাদের ভাল খেতে দিতে পারিনে, তাই না আসতেই আগে বাড়ী যাবার জন্যে ব্যস্ত হও।

আমজাদ—অর্থাৎ সখিনার ভাই তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—ছিঃ, পাগলী! এ সব বলতে নেই। তোর বাড়ী এসে কি আমি কোন দিন না খেয়ে গেছি? ও-সব কথা বলে মন খারাপ করতে নেই।

সখিনা অভিমান-ভরা কণ্ঠে বললো—কেন বলবো না, তোমরা মোটে আমায় দেখতে আসতে চাও না; আর যদি ভুলক্রমে একবার এসে পড়, তা'হলে বাড়ী যাবার জন্যে আগে ব্যস্ত হয়ে পড়।

—ওরে রাগ করিস্‌নে, পাগলী! এখন্‌ অসময় থাকা যায় না, সময় মত এসে, তুই যে ক'দিন থাকতে বল্‌বি—সেই ক'দিন থাকবো।

—তুমি যেবার আসো, সেইবারই ঐ কথা বলো।

—এবার ঠিক্‌ ঠিক্‌ বল্‌ছি।

—বললেও যাওয়া হবে না। উঁ বাজারে মাছ তরকারি আনতে গেছে, তোমরা চলে গেলে খুব রাগ করবে।

করিম বললো—আমার থাকবার যো' নেই। বাড়ী না গেলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।

সখিনা কৃত্রিম রাগের সাথে বললো—ক্ষতি আপনার হবেই; কেননা, আমি তো আপনার বোন নই। নিজের বোনের বাড়ীতে ইচ্ছামত থাকা যায়, আর পরের বোনের বাড়ীতে থাকতে অনুরোধ করলেও থাকা যায় না।

করিম আর কোন কথা বলতে পারলো না। বললো—যাক, আর কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই; তুই যখন এতো রাগ করছিস, তখন আজকের রাতটা থেকে যাই, কাল সকালে কিন্তু চলে যাব।

—তাই যেও। সখিনা ঘর থেকে নেমে রান্না ঘরে গেলো খালি কলসি-গুলোতে পানি তুললো। খুঁটি-নাটি কাজ সেরে ড্যাফল তলা থেকে এক বোঝা কঞ্চি নিয়ে এসে কাটতে বসলো। কাঠের জ্বালানী ফুরিয়ে গেছে। আজ থেকে কঞ্চি জ্বাল দিতে হবে। কঞ্চি জ্বলে ভাল, তবে ওর দোষ হচ্ছে—ধরে গেলে ফট ফট্‌ শব্দ করে গেঁরো ফাটে।

জ্বালানীর বোঝা রান্না-ঘরে আঁকার পাড়ে রেখে বাইরে আসতেই দেখে, নিয়ামত ফিরে এসেছে— একটা মোরগ, একটা রুইমাছ আর আলু কলা নিয়ে। সখিনা এ-সব হাতে করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো—টাকা ক'টা সব খরচ করে এসেছ ?

—তা' প্রায়, আর ক'আনা পয়সা আছে মোটে।

—থাকবে না ! তোমার হাতে টাকা দিলে তা' কি আর ফিরে পাওয়া যায় ! সব শেষ করে তবে ছাড়বে।

—আঃ ! অতো বকো কেন, ওরা শুনলে বলবে কি !

—ওরা বাড়ী নেই, মাঠের দিকে বেড়াতে গেছে। মোটে থাকবে না, জামা-কাপড় নিয়ে বেরুলো ; আর কি ! আমি রাগ করলাম, তাই থাকলো ; বলে গেল—আমরা বেড়িয়ে আসি।

সখিনা মাছ-তরকারি নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল। নিয়ামতকে বললো, মোরগটা জবাই করে দিতে।

নিয়ামত বললো—ওরা ফিরে আসুক, আমি তাড়াতাড়ি যেয়ে গরু দু'টো নিয়ে আসি।

নিয়ামত মোরগটা টুকরার মধ্যে ঢেকে রেখে মাঠের দিকে চলে গেল। সখিনা মাছ কুটতে বসলো।

পরিছন এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলো—ও ছোট বু' !

প্রথম ডাকটা সে শুনতে পায়নি। সে তখন আপন মনে মাছ কুটছিল আর বাপের বাড়ীর কথা চিন্তা করছিল। অনেকদিন সে স্বামীর বাড়ীতে রয়েছে। একবার সেখানে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে তার নারীমন ছট্‌ফট্ করে। আবার যখন সংসারের কাজের মধ্যে ডুবে যায়, তখন সে সব কথা ভুলে যায়। আজ আবার বাপের সংসার থেকে বিচ্ছেদের কথা মনে করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে ! বড় ভাই এসেছে—যদি তাকে নিয়ে যেত, তা'হলে সে খুব খুশী হতো।

পরিছন আবার ডাকলো—ও সখিনা।

—কে, বড় বু' ?

—হ্যাঁ, তুই কি করছিস ?

—মাছ কুটছি, তুমি ওখানে কেন! এদিকে এসো।

—রান্নাঘরে বসে বসে মাছ কুটছিস, অথচ আমি এত ডাকাডা করছি, তা' শুনতে পাচ্ছিস নে? বাপের বাড়ীর কথা ভাবছিস্ বুঝি, বুঝতে পেরেছি। ভাববার কথা বটে, এখনও তো ছেলে-মেয়ে হয়নি, ত স্বামীর সংসারের প্রতি ভাল করে মন বসেনি। থেকে থেকে বাপের বাড় কথা চিন্তা হয়।

বড় জা'য়ের কথা শুনে সখিনা লজ্জায় মাথা নীচু করলো। পরিছন সাম দাঁড়িয়ে তার মাথাটা উঁচু করে ধরে বললো—তা' এতো লজ্জা কিসের রে আমি কি মন্দ কথা বলেছি? এমন বয়সে সব মেয়েদের বাপের বাড়ীর টা বেশী। আমারও তো একদিন বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য মন ছটফট করতো তাদের আসতে দেরী হলে খবরের পর খবর দিয়েছি। কেউ আসলে আমারে না নিয়ে চলে গেলে ঘরের কোণে বসে বসে কত কান্না কেন্দেছি। তারপ ছেলেমেয়ে হ'ল—খালি কোল ভর্তি হ'ল, হালকা মন ভারি হ'ল, স্বামী সংসারের প্রতি বেশী করে টান এসে গেল; বাপের বাড়ীর কথা ভুলে গেলাম। তবে একেবারে ভুলে যাইনি, আগে যেমন যখন-তখন বাপে বাড়ী যাওয়ার জন্য অস্থির হতাম, এখন আর তা' তো হইনে! মনের যে কেমন পরিবর্তন হয়ে গেছে। এমন প্রত্যেক নারীর জীবনে হয়ে থাকে তা' যাক, তোর ভাইরা কি চলে গেছে?

—না, ওদিকে কোথায় বেড়াতে গেছে।

—সারাদিন ছেলে-মেয়ে, রান্নাবাড়া নিয়ে কেটে গেল, এদিকে একবা আসতে পারলাম না; তা' দেখা করি কি করে। ওরা ফিরে এলে ব ভাইকে বলিস, যেন আমার সাথে দেখা করে।

—ভাই তোমার সাথে এখনও দেখা করেনি?

—না।

—সে কি কথা! ভাই-ই বা কেমন লোক! আচ্ছা, বাড়ী আসুক— বলবো সে কথা।

পরিছন রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

সখিনার মাছ কুটতে কুটতে মনে হল - ওরা মনে করবে আলাদা হয়েছি বলে কেউ এলে দেখা করে না। আর দেখা যদি না করে, তার জন্য দোষী হব আমরা! লোকে মনে করবে—ওদের বাড়ী যেতে, ওদের সাথে দেখা করতে, কথা বলতে, আমরা বারণ করি। কেউ যদি এমন কথা মনে করে, তা'হলে তার অন্যায় হবে না। কেন না, যখন একত্রে ছিলাম, তখন কেউ এলে সবার সাথে দেখা করতো। আর এখন আলাদা হয়ে কি-ই বা এমন অন্যায় হয়েছে যে, একেবারেই বাদ দিতে হবে! বড় বু'র কোন ভাই নেই। তাই তার ভাইয়েরা এসে যদি ওদের সাথে দেখা করে, তা'হলে তার মনে দুঃখ লাগবারই কথা। বু' বলবে—আমার যদি একটা ভাই থাকতো, তা'হলে আমায় দেখতে শুনতে আসতো। ওরা আলাদা হওয়ার পরে সখিনার বড় ভাই এই প্রথম এসেছে। এখানে এসে আগে সখিনার সাথে দেখা না করে তার বড় জা'য়ের সাথে দেখা করা উচিৎ ছিল। তার বড় ভাইয়ের এহেন ভুলের জন্যে ওরা যাতে রাগ না করতে পারে, তার জন্যে সে মাছ কুটা শেষ করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ঢেকে ঢুকে রেখে বড় জা'য়ের কাছে গেল।

পরিছন তখন চা'ল হাড়িতে দিয়ে ধুচ্ছিল। সখিনা রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলো—বু'!

পরিছন পিছন দিকে না তাকিয়েই বললো—কে, ছোট বৌ?

—হ্যাঁ।

—কি বলছিস?

—আমার বড় ভাসুরকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

—তার শরীর খারাপ, সে কি মাছ-গোশত খাবে! হয়তো যেতে চাইবে না। তার চেয়ে বড় ভাইয়েরা অনেক দিন পর এসেছে, তাদের খাওয়াগে।

—যা' খায়, তাই খেয়ে আসবে—তুমি বল।

—আচ্ছা, বলবোখ'ন।

সখিনা চলে এলো। তার আর দাঁড়াবার সময় নেই। এখনও তার অনেক কাজ। তরকারি কুটবে, ভাত চড়াবে—আবার মোরগ জবাই করে দিলে তা' পরিষ্কার করে কুটতে হবে। তার আর সময় কোথায়! একা মানুষ! এক হাতে সব কাজ করতে হবে।

সন্ধ্যে হতেই ও-পাড়ার নছর মণ্ডল আর লবা এসে হাজির। সখিন রান্না-ঘর থেকে গলার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এলো। হাতনের দেওয়ালে উপর রাখা বেঁদে পাটিটা নিয়ে এসে বাইরে উঠোনে পেতে দিল। বললো— বসো, জামাই।

—নিয়ামত কই ?

—আমার ভাইয়েরা এসেছে, তাদের নিয়ে কোথায় বেড়াতে গেছে বসো, এখনই এসে পড়বে।

সখিনা এক সিলিম তামাক সেজে হুকোটা নছর মণ্ডলের হাতে দিয়ে বললো—বসে বসে তামাক খাও জামাই, ওরা এখনই এসে পড়বে। নছর মণ্ডল হুকোটা হাতে নিতে নিতে বললো—তামাক তো খাব, কিন্তু শরীর ভাল ঠেকছে না। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম নিয়ামতের কাছে।

—তা' একটু বসো, আস্‌লে জিজ্ঞেস করে যেও।

সখিনা রান্না-ঘরে যেয়ে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে মালসার উপর উপুর করে কড়াটা আঁকায় চাপিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই নিয়ামত তার শালাদের নিয়ে বাড়ীতে এলো। এসে দেখে তার সাথে যারা মাঠে কাজ করে, তারা সব এসে বসেছে। সে এলে নছর মণ্ডল জিজ্ঞেস করলো—ক'নে বেড়াতে গেলি ?

—যাব আর কোথায়! মাঠের দিকে গেলাম। ভাইয়েরা এসেছে, ধান পাট দেখিয়ে নিয়ে এলাম। তোমরা কখন এলে ?

—এই তো, কেবলমাত্র এসে বসেছি। বৌ-মা তামাক সেজে দিয়ে গেল— তাই টানছি। যাক, খবর-টবর কি ?

—কিসের খবর ?

—কালকে মিয়া সাহেব নেবে কি-না—তাই জিজ্ঞেস করছি।

—হ্যাঁ, নেবে।

—কোথায় নিড়োবে ?

—খালের ধারে যে জমিতে পাট বুনচে, ঐখানে নিড়াতে হবে।

—অতো বড় ভুঁই, কালকে একদিনে পারা যাবে ?

—যদ্দুর পারা যায়—তদ্দুর নিড়োবো।

—মনে হয় পরশু দিনও মিয়া সাহেব নেবে।

—নিতে পারে।

—পরশু দিন আবার দবিরের গাতা। ও আবার দেবে তো? ওর নিজের ভুঁইও এর মধ্যে জো' হয়ে যাবে।

—না দিলে হবে কি করে। কালকে যদি মিয়া সাহেবের ভুঁইতে যেয়ে লাগি, তা'হলে শেষ না করে রেখে দিলে রাগ করবে না? দবির ভাইকে না হয় তার পরদিন দিলে হবে।

—সে ব্যবস্থা পরে যা' হয় করলে হবে। ওরে লবা! হুকোটা দে দেখি—ক'টা টান দিয়ে যাই।

লবা হুকোর লম্বা একটা দম দিয়ে ডান হাতের মাস্থলে মুখটা মুছে নছর মণ্ডলের দিকে এগিয়ে দিল। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সন্ধ্যের দৈনিক অতিথিরা সব উঠে দাঁড়ালো। নিয়ামত বাঁধা দিয়ে বললো—উঠছো কেন চাচা, বসো।

—না, আর বসবো না—রাত অনেক হয়ে গেছে, বাড়ী যাই।

—আর একটুখানি বসো, ভাত হয়ে গেছে, দু'টো খেয়ে যাও।

—তা' হোক গে, বরাত থাকে—আর একদিন খাব।

সকলে যার সেই বাড়ীর দিকে চলে গেল; নিয়ামত উঠে বেঁদে পাটিটা বার-দুই ঝেড়ে গুটিয়ে হাতনের পাকার দেয়ালের উপর তুলে রাখলো। হুকোটা ড'রগায় হেলান দিয়ে রেখে রান্না ঘরে গেল। সখিনাকে জিজ্ঞেস করলো—ভাত হয়েছে?

—হয়ে গেছে, এবার থালা-বাটা-ঘটি ধুয়ে ভাত বাড়ছি।

—তুমি ভাত বাড়, আমি গরুর নান্দায় দু'টো জাউনা দিয়ে আসি।

নিয়ামত গরুর নান্দায় জাউনা দিয়ে এসে খেতে বসলো। সখিনা রান্নাঘর থেকে সব নিয়ে এসে স্বামী আর ভাইয়ের খাওয়াতে লাগলো। ওর ভাই বললো—এতো সব খাব কি করে? পেটে ধরাবে না যে!

এতো আর কোথায়! কিছু জোগাড় করতে পারিনি, মাত্র দু'ভাগের তরকারি রেঁধেছি—তাই এতো হয়ে গেল! মোটে আসো না, এই এসেছো

আবার কবে আসবে তার ঠিক নেই ; দু'টো ভাল খেতে দেবো—তা' পারলাম না।

সখিনার কথা শুনে সবায় হেসে বললো—মাছ, গোস্ত সব খেতে দিচ্ছো, তাও আবার বলছো—কিছু খেতে দিতে পারলাম না! এর চেয়ে আবার কি ভালো ভাল জিনিস আছে? মাছ গোস্তের চেয়ে আর ভাল জিনিস আছে বলে আমার জানা নেই ; তোমার যদি জানা থাকে, তা'হলে বল আমরা জেনে রাখি।

সখিনা এবার মাথা নীচু করে রইলো। নিয়ামত হেসে বললো—কি হ'লো, ঘাড় নীচু করে রইলে কেন? কথা বল!

সখিনা চোখ পাকিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো তুমি আবার কথা বলছো! এ সব বলা কর্তব্য, তাই বলছি।

করিম বললো—কর্তব্য নয়, এটা একটা নীতি। মাছ-মাংস, পোলাও-কোরমা খেতে দিলেও বাড়ীওয়ালা বলবে আহ! কিছুই খেতে দিতে পারলাম না। বাঙালীদের এটা একটা রীতি হয়ে গেছে।

নিয়ামত হাসতে হাসতে বললো—বোনের হয়ে কথাটা বলে তাকে জিতিয়ে দিলেন, কিন্তু আমার উপরে যে চোখ রাঙিয়ে কথা বললো—তার জন্য আমাকে সাহায্য করলো না কেউ! নিয়ামতের কথা শেষ হলে সবায় হেসে উঠলো।

আমজাদ কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সখিনা বাঁধা দিয়ে বললো—নাও, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, হাত-মুখ ধুয়ে ফেল।

নিয়ামত বক্র কটাক্ষে সখিনার দিকে তাকিয়ে বললো—হ্যাঁ, আর কথা বাড়ানোর দরকার কি, উনি তো জিতেছে!

—জিতবো না! একশো'বার জিতবো। সব জায়গায় তোমরা জিততে চাও, আমাদেরও তো জিত্‌তে আছে।

—তোমার আমার মধ্যে যখন ফাঁক নেই, তখন তুমি জিতলেও যা, আমি জিত্‌লেও তাই।

করিম বললো—দেখলে ভাই সাহেব, নিয়ামত ভাই কিন্তু খুব চালাক লোক। এক কথায় আমাদের ঠকিয়ে দিয়ে উনারা দু'জনেই জিতে গেলেন।

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেলে, সখিনা সব গুছিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে গেল। সে তার ভাসুরকে নিমন্ত্রণ করছিল, কিন্তু আসেনি। তার স্বামীকে ডাকতে পাঠিয়েছিল, পেট খারাপ করেছে বলে আসেনি। তাই সে বাসন-বাটি ধুয়ে আগে ভাসুরের জন্য ভাত-তরকারি বেড়ে নিয়ে গেল। যেয়ে দেখে —তারা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘরের প'টেয় দাঁড়িয়ে ডাকলো—বু' !

—কেডা, ছোট বৌ !

—হ্যাঁ।

—কি বলছিস ?

—বলছিনে কিছু, ভাসুরের জন্য ভাত-তরকারি নিয়ে এসেছি।

—আবার ও-সব কেন ? ওর পেট খারাপ করছে, ও খাবে না—তুই নিয়ে যা !

—উনি না খায়, খোকা-খুকিদের খেতে দিও।

—তারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার ডাকাডাকি করলে কাঁচা ঘুমে উঠে কান্নাকাটি করবে, তার চেয়ে তুই নিয়ে যা।

—না হয় কাল সকালে খেতে দিও। ক'নে রেখে যাব—তাই বল।

—একান্ত যদি নাই-বা শুনতে চাস, তা'হলে একটু দাঁড়া ! আমি টেমিটা ধরিয়ে নি'।

পরিছন আড়ামোড়া ছেড়ে দু'হাতে চোখ ডলতে ডলতে উঠে বালিশের তল থেকে দেয়াশলায় বের করে ওর গায় যে টেমি ছিল—তা' ধরালো। টেমি হাতে করে পটের উপরে দাঁড়িয়ে সখিনার কাছ থেকে ভাতের বাসন আর বাটি নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

সখিনা ফিরে এসে খেতে বসলো। খেতে খেতে হঠাৎ তার মনে হল, সে ভাত-তরকারি দিয়ে এসেছে তার ভাসুরের। তাঁর পেট খারাপ করেছে, তিনি তো খাবেন-ই না—তা'ছাড়া ছেলে মেয়েদেরও খেতে দেবে না। কেননা, এখন তার ভাসুরকে ডাকবানে ভাত খেতে। ভাসুর বলবেন—আমি খাব না, খোকা-খুকিদের খেতে দাও। বু' বলবে—ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, এখন ডাকলে কান্‌বে। ভাসুর হয়তো বলবেন—তবে কাল সকালে খেতে দিও। তাঁর উত্তরে বু' বলবে—হ্যাঁ, গরমের সময় ! এখন রেখে দিলে নষ্ট হয়ে

যাবে না? তখন ভাসুর আর কি বলবেন! হয়তো বলবেন—তবে তুমি খেয়ে ফেলে দাও। তার জা' পরিছন তখন আর একটি কথাও বলবে না, ভাতের বাসন নিয়ে খেতে বসে যাবে। সে তার জা'কে চেনে। কয়েক বছর একত্রে ছিল। তখন সে দেখতো—ভাল মাছ মাংস রান্না হলে মাছের পেটিগুলো আর মাংসের দিল পরান, ভাল গোস্তগুলো দিয়ে ছেলে মেয়েদের ভাত মেখে দিত। ছোট ছেলে-মেয়ে আর ক'খানা মাছ, গোস্ত খেতে পারে! দু' একখানা খেয়ে সব রেখে দিত, তখন তার জা' ছেলে-মেয়েদের যা' ইচ্ছে তাই বলে গালাগালি দেবে। হতচ্ছাড়া খ্যায় কুড়ীর দল, হাড়গিলে পেটুকের দল—খেতে পারবে না, তা-ও নেবে আর মেখে মেখে নষ্ট করে থোবে। কিন্তু ঐ খ্যায়কুঁড়ে আর হাড়গিলেদের জন্যে যে ওর পেট ভর্তি হয়, তা' বলবে না। সখিনা যখন এ-বাড়ীতে নতুন এসেছে, তখন কয়েকদিন এ-কথা শোনার পর ও মনে করতো—তাইতো ছেলেটা তো খুব দুষ্ট হয়েছে। তারপর একদিন সে খেয়াল করে দেখলো—ওদের কোন দোষ নেই। তারা খেতে বসলে যা দেবে, তাই খেয়ে উঠে যাবে, বরং ওদের মা বেশী করে দেবে আর ওরা বলবে—অতো না, অতো দিও না। তখন মা চোখ রাঙিয়ে ছেলে-মেয়েদের চুপ করিয়ে বেড়ে-মেখে সামনে দেবে। বাড়ীতে একটা আত্মীয় এলেও ভাল জিনিষ তার জা' বেশীর ভাগ খেয়ে ফেলে। একদিন তার বড় জা'র এক মামাতো ভাই এসেছিল। সে শহরে থেকে পড়ে! এখানে বড় একটা আসে না। সখিনা এসে পর্যন্ত তাকে ঐ একবারই আসতে দেখেছে। সখিনা মনে করলো—শহরে থাকা ছেলে—ভাল খায়, পরে। বু' যে রকম লোক, হয়তো দেবানে হাড়গোড়। ও-সব খেয়ে গেলে আর হয়তো আসবে না। তাই সেদিন সে ইচ্ছে করেই রান্না ঘরে যেয়ে ভাত, তরকারি বাড়লো। পরিছন স্নান সেরে এসে দেখে—ছোট বৌ রান্না করা ভাত, তরকারী বেড়েছে আর ছেলেটা ভাত খাচ্ছে। ছেলের পাতে মোটে চারখানা গোস্ত। আর যায় কোথায়! গরম তেলে যেন রসুন পড়লো। কাঁখের কলসিটা দড়াম্ করে মাটিতে নামিয়ে রেখে ছেলের হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে রান্না ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। বেরো—বেরো রাক্ষসের দল! আমরা হা-ঘুরে! কোন কালে কিছু খায়নি—এ বাড়ী খেতে এসেছি। আমরা সব খেয়ে ফেলি—তাই উনি আজ

মাতব্বরি করতে এসেছে। আমার ভাই এসেছে, মনে করেছে- ওরা ভাইবোনে সব খেয়ে ফেলবে, আমাদের আর দেবে না। তারপর সে-কি হুলস্থুল কাণ্ড! দু'হাতে মাথায় চুল ছিঁড়তে লাগলো আর মুখ দিয়ে অজস্র গালাগালি করতে লাগলো। সখিনাকে উদ্দেশ্য করে বললো—তোমাদের পেট যদি না ভরে, তা' হলে আজ পেটভরে খেয়ে নাও। ও বাড়ী আসুক, বলবো—আজই আমার বাপের বাড়ী রেখে এসো। আমার জন্যে এ বাড়ীতে কারও সুখ নেই। ও যদি না থুয়ে আসে, তা' হলে আজই আমার ভাইয়ের সাথে চলে যাব। যেমন নবাবের মেয়ে, তেমন নবাবের বৌ; এখান থেকে একটা কুটো সরিয়ে ওখানে নিয়ে যাবার নাম নেই, তার আবার মাতব্বরি ফলাবার গুন আছে। সেই কোন যুগ্ গি এসে পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে চরকীর মত ঘুরছি, কোন দিন কারও সাথে কিছু হল না, কেউ মন্দ বলতে পারলো না। আর এই নবাবের বেটি এ ভিটের পা দিয়েই আমার সাথে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে! তা' এতই যদি মাতব্বরি করবার ইচ্ছে থাকে, তা' হলে আমার উপরে কেন সস্তান হয়ে নিজের সংসারে করোগে। ও বাড়ী এলে একটা হ্যাস্ত ন্যাস্ত করবোই। হয় আমার বাপের বাড়ী রেখে আসবে, নয়তো আজই সন্তার হবো।

ভিজে কাপড় বদলিয়ে একলাফে হাতনেয় উঠে তার ভাইয়ের সামনে থেকে ভাতের থালাখানা আর তরকারির বাটিটা টেনে নিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সখিনার সামনে ধপাস করে ফেলে দিয়ে বললো—তোদের তো খেয়ে পেট ভরে না, এবার বসে বসে গেলো। ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে পরিছন ঘরের মধ্যে যেয়ে গুম্ হয়ে বসে পড়লো। তার ভাই হাত ধুয়ে কেবল ভাতের থালায় হাত দিতে যাবে, তখনই সে থালা টেনে নিয়ে গেল। বোনের এ-হেন ব্যবহারে ভাই বিমূঢ়ের মত বসে রইল। পরিছন ঘরের মধ্যে থেকে চীৎকার করে বললো—তুমি এখনও বসে রয়েছো? বাড়ীতে ভাত নেই? বোনের বাড়ী এসেছো ভাত খেতে। ভাই রফিক আর কি করে! আস্তে আস্তে সেই অবস্থায় বাড়ীর পথে পা বাড়ালো। এদিকে সখিনা তখন রান্নাঘরে বসে নিজের কৃত কার্যের জন্যে মাথার চুল ছিড়ছিল। সে যখন দেখলো রফিক ভাই চলে যাচ্ছে, তখন আর বসে থাকতে পারলো না। দৌড়ে যেয়ে তার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললো

তোমার দু'টি পায়ে পড়ি ভাইজান, তুমি যেও না। এমন অবেলায় না খেয়ে গেলে অমঙ্গল হবে। আমার অন্যায়ের জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি চলো—দু'টো খেয়ে যাও। রফিক মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল তার পায়ের উপর উপুর হয়ে পড়ে থাকা সখিনার দিকে। তার হাত ধরে টেনে তুলবে—সে কথাটুকুও সে বেমালুম ভুলে গেছে। সে বুঝতে পারলো না এখন কি করবে। আর এ-ক্ষেত্রে দোষই বা কার! তার নিজের বোনের—না, সখিনার—না, তার নিজেরই! কোন কিছু স্থির করবার মত শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে। এই অল্প বয়স্কা অবুঝ মেয়েটা কি এমন গুরুতর অন্যায় করেছে যে, তার জন্যে তার বোন এমন হুলস্থুল কাণ্ড করতে পারে! রফিক মনে মনেই বুঝলো—অন্যায় তার নিজেরই। কেন না সে যদি না আসতো, তাইলে এমনটি হতো না।

॥ ১০ ॥

হঠাৎ রফিকের মনে হল—তাই তো ! সখিনা যে এখনও তার পা ধরে পড়ে রয়েছে। এ-কথা মনে হতেই সে তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে তুললো। সে বললো, তুমি কোন অন্যায় করোনি—করেছি আমি। আজ যদি আমি না আসতাম, তা' হলে নিশ্চয় এমন গোলমাল হতো না। এ-কথা শুনে সখিনা তার হাত ধরে ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো—ও-কথা তুমি বল না, ভাইজান! কেন না, ভাই এসেছে বোনের বাড়ী—তাতে আবার দোষ কিসের! সম্পূর্ণ দোষ আমারই।

সখিনা রফিকের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তার ঘরের হাতনের। বিছেন পেড়ে বসতে দিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল। যেয়ে দেখে রফিকের জন্যে আগে যে গোস্ত বেড়ে দিয়েছিল, যা' পরিছন তার সামনে ফেলে দিয়ে গেল সে সব বিড়ালে খেয়ে ফেলেছে। সে আর কি করে! নোংড়ায় আর যেটুকু ছিল, তার মধ্যে থেকে বেছে বেছে গোস্তগুলো আবার একটা বাটিতে তরকারি নিয়ে রফিককে খেতে দিল। রফিক একবার চারিদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে হাত ধুয়ে খেতে বসলো। খেতে খেতে সে অনেক কিছুই চিন্তা করলো। তার বোন পরিছনকে সে অনেকবার দেখেছে। তার সম্বন্ধে ওর বেশ ভালভাবেই জানা আছে। পরিছনের নিজের কোন ভাই নেই। তাই সে তাকে খুব স্নেহ করতো। কিন্তু সেই স্নেহ ভাবটা দেখাতো কেবল বাইরের দিক থেকে। অন্তর দিয়ে কোন দিন সে তার এই ফুফাতো বোনের কাছে স্নেহ প্রীতি পায়নি। বাড়ীতে ভাল মাছ-মাংস রান্না হলে পরিছন সব খেয়ে ফেলতো। আত্মীয় বাড়ীতে যেয়েও তার সেই স্বভাবের কোন পরিবর্তন হ'ত না। মা-বাপ কিছু বললে—সেই যে গড়াগড়ি ধরবে, তা' আর সমস্ত দিনের মধ্যে উঠবে না। বিয়ের আগে পর্য্যন্তও পরিছন তেমন ছিল। সবায় মনে করতো—বিয়ে হয়ে গেলে সব ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু তার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে! কেবল গড়াগড়ি দেওয়াটা বন্ধ হয়ে

গেছে, তবে তার পরিবর্তে মুখের বিশ্রী গালাগালিটা বেড়ে গেছে। তার বোনের বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল। এর মধ্যে তার পূর্ব স্বভাবের যে পরিবর্তনটুকু হয়েছে, সেটুকু না হওয়াই ভাল ছিল। কেন না, বিশ্রী গ্যলাগালের চেয়ে গড়াগড়ি দেওয়া অনেক ভাল। আজকের এই ব্যাপারে সখিনার কোন অন্যায় আছে বলে মনে হয় না. হ'তে পারেও না। এমনি কত সব নানা রকম চিন্তা করতে করতে রফিকের খাওয়া হয়ে গেল! সখিনা থালা বাটিগুলো নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল। তারপর সব ঢেকেঢুকে রেখে নিজের ঘরে যেয়ে বসে বসে কাঁথা সিলায় করতে বসলো।

দুপুর গড়িয়ে গেলে নিয়ামত আর আসমত দু'ভায়ে মাঠ থেকে বাড়ী এলো। সমস্ত দিনের পরিশ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে বাড়ী এসে দেখলো বাড়ীটা যেন কেমন একটা গুমোট ভাব ধারণ করেছে। আসমত ডাক দিল—কই, ক'নে গেলে! কোন সাড়া না পেয়ে আবার ডাক দিল—ও খোকা! তবুও কোন উত্তর না পেয়ে রাগের সাথে বললো—বাড়ীতে সব মরেছে নাকি! গেল ক'নে সব? আসমত এগিয়ে যেয়ে হাতনের ডরকান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলো—ঘরের দোর খোলা। ঘরের মধ্যে খোকার মা ছেলেমেয়ে নিয়ে গুম হয়ে বসে রয়েছে। বৌর দিকে একবার তাকিয়েই আসমত বুঝতে পারলো—নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। সে বুঝলো, রাগলে আর পরিছনকে উঠানো যাবে না। এমন অবস্থায় তাকে মেরে যদি গালের চামড়া তুলে দেয়, তবু পরিছন তেমনই নির্বিকার বসে থাকবে। এক ফোঁটা চোখের পানিও ফেলবে না। বৌ'র এমন ভাব সে অনেকবারই দেখেছে, তাই তার মনে যে কি করে ভাবতে হয়, তা, তার জানা আছে।

আসমত নিড়েন টুকা হাতনের উপরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। বৌ'র কাছে যেয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো—বলি, তোমার হল কি! এমন করে বসে আছ কেন?

পরিছন কোন কথা বললো না।

আসমত আবার বললো—এমন করে রাগ করে বসে থাকলে হবে, উঠবে না?

পরিছন তবু কোন কথা বললো না।

— বোবার মত বসে থাকলে হবে? কি হয়েছে, সেটা না হয় বল— আসমত বৌ'র মাথায় হাত দিয়ে বার কয়েক ঝাকি দিয়ে বললো— কি হল, বলবে না, কি হয়েছে?

পরিছন তার স্বামীর হাতখানা ধরে এক হাঁচকা' টান দিয়ে মাথার পর থেকে নামিয়ে বললে— সরে যাও, এখন এসে আর আদর দেখাতে হবে না।

আসমত নাছোড় বান্দা! বলে—আরে ছাই, কি হয়েছে—তা' বলবে তো?

পরিছন মুখ ঝামটা মেরে বললো- কিচ্ছু হয়নি, যাও এখান থেকে। কতবার তোমাকে বলবো এ-কথা! তোমার কাজ তো নেই, তা'ছাড়া চোখের মাথাও খেয়ে বসে আছো। তুমি কিচ্ছু দেখতেও পাও না, কিছু শুনতেও পাও না।

—কেন, কি হ'ল আজ আবার?

—হবে আবার কি? রোজ যা' হয়ে থাকে! কোন যুগগি এ-সংসারে এসে যাতাকলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি—কোনদিন কিছু হ'ল না, আর ঐ নবাবের বেটি এ-সংসারে আসতেই আমার সব সুখ-শান্তি ফুরিয়ে গেছে।

আসমত বাঁধা দিয়ে বললো—ছিঃ! এমনভাবে বক কেন? ভাই এসেছে না?

পরিছনের কাটা ঘারে এবার যেন নুনের ছিটা পড়লো। বললো— ঐ ভাই এসেই তো যত গোলমাল! তার বাড়ী ভাত নেই—এখানে এসেছে তোমাদের সব খেয়ে শেষ করতে! রোজ রোজ আমি একা সব খেয়ে ফেলে দি' আজ আমার ভাই এসেছে—সব দু'ভাই-বোনে খেয়ে সাবার করবে—তাই নবাবের বেটি আমার উপরে মাতব্বরি ফলাতে গেল। আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাইনে; হয় আমার ভাইয়ের সাথে আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, নয়তো এখনই সস্তার হও; নয়তো আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

গলায় দড়ি দেওয়ার কথা শুনে আসমতের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। সে বুঝলো—নিশ্চয় মারাত্মক কোন কিছু হয়েছে, নইলে এমনি কথা তো কোনদিন বলিনি। সে আর স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে বা কথা বলতে সাহস

করলো না। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওদিকে নিয়ামত সখিনাকে ডেকে বললো—ব্যাপার কি! বাড়ীতে আজ আবার কি হল!

সখিনা কি হবে!' বলে হেসে ফেললো।

—কিছুই হয়নি, তবে এমন অবেলায় কাঁথা সিলাই করছো কেন?

সখিনার কিছু বলবার আগেই রফিক বললো, গণ্ডগোল অবশ্য হয়েছে—তার জন্যে সখিনা বু'র কোন দোষ নেই; যত দোষ আমার বোনের। আজ প্রায় দশ পনের বছর বিয়ে হয়েছে—ছেলে-মেয়ে হয়েছে, তবু পূর্ব স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। এ ব্যাপারে সখিনা বু'কে কিছু বলবেন না, আমার চোখের সামনে তো সব হল' আর পরিছন বু'কে আমি ছোট থেকেই ভালভাবেই জানি।

সখিনা কাঁথা সিলাই বন্ধ করে তার ভাসুরকে, স্বামীকে তেল দিল। তারা তেল গায়ে-মাথায় ঘষে স্নান করতে গেল। স্নান করে এলে সখিনা তাদের ভাত-তরকারি বেড়ে খেতে দিল। স্বামী-ভাসুরকে খাইয়ে এঁটো বাসন-পত্র ধুয়ে পরিষ্কার করে সব ঢেকে ঢুকে রেখে না খেয়ে রান্না ঘরের শিকল তুলে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার পরের দিনই আসমত উপায়ান্তর না দেখে লোকজন আত্মীর-স্বজন ডেকেডুকে সব ভাগ করে নিল। ভাইয়ে ভাইয়ে অবশ্য কোন দিন মনোমালিন্য হয়নি। যতদিন মা-বাপ বেঁচে ছিল, ততোদিন অবশ্য এমন ব্যাপার যে হয়নি, তা' বলা চলে না; তবে এতদূর গড়ায়নি। আসমত দেখলো তার স্ত্রী যেমন ধরণের মেয়ে, তাকে নিয়ে সংসারে এক হয়ে বাস করা মানে—দোজখ ভোগ করার সমান। তার জীবনের সুখ-শান্তি তো গেছেই' তা' ছাড়া তার ছোট ভাইয়েরও জীবন নষ্ট। অনেকদিন ভেবে চিন্তে আসমত আত্মীয়-স্বজন ডেকে সব ভাগ করে নিল। ভাগাভাগির দিন আর একবার হুলস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল। পরিছন এটা ধরে টানে—বলে, এটার ভাগ কারো দেব না। ওটা ধরে টানে—বলে, এর ভাগ কেউ পাবে না।

সেদিন ময়নার মার সে কি চীৎকার! এ পাড়ার মেয়েদের মধ্যে সখিনার প্রতি প্রাণের টান যদি কারও থাকে, তা' কেবল এই ময়নার মারই আছে। ভাগাভাগির সময় পরিছন যখন এটা-ওটা ধরে টানাটানি করছিল, তখন কোথা থেকে ময়নার মা ছুটে এসে পরিছনের হাত ধরে একটা ঝাকি দিয়ে মাথা নাড়িয়ে

মুখ ভেঙচিয়ে বললো—ওরে আমার নবাবের বেটিরে—এটা দিবিনে, ওটা দিবিনে—এ-সব কি তুই বাবার বাড়ী থেকে নিয়ে আইলি ? খাওয়া অলক্ষুণে মাথাখাকী মাগী ! বল, এ-সব কি তোর বাবার বাড়ীর জিনিস ? ময়নার মা এক ধাক্কা মেরে পরিছনকে ফেলে দিয়ে ধুতি কাপড়খানা কোমরে জড়িয়ে রণ-রঙ্গিনী বেশে ঘরের জিনিস-পত্র সব বাইরে টেনে বের করে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো—নাও, এবার তোমরা ভাগ করে নাও। নবাবের বেটি খ্যায়কুড়ী মাগী শাশুড়ীর জিনিষ বলতি কি আর কিছু থুয়েছে ? সব খ্যায় করেছে। যা আছে, তারও ভাগ দেবে না ! ওর কোন্ বাবা তৈরী করে দিয়ে গেল এ-সব। ময়নার মা একবার মুখ খুললে সারা দিন চলে যাবে—রাত আসবে, তবুও তার মুখের কথা ফুরোবে না—এ-কথা সকলের জানে। তাই উপস্থিত সবার তাকে বার বার অনুরোধ করে হাত-পায়ে ধরবার কথা বলে বুঝিয়ে শুনিয়ে থামালো। কিন্তু ময়নার মা কি সোজা মেয়ে ! ভাগের কোন জিনিষ সখিনার দিকে কম পড়লেই আবার সেই চীৎকার ! যতসব হা-ঘরে ঘুষখোরের দল। হাড় হা-ভাতে লক্ষীছাড়ার দিকে সকলের প্রাণের টান ! বলি—কত টাকা ঘুষ দিয়েছে পরিছন ? তোমাদের দিয়ে কোন কাজ হবে না। মিয়া সাহেবের ডাকোনি কেন ?

আসমত বললো—মিয়া সাহেব বাড়ীতে নেই।

—বাড়ী নেই, তবে তোমরা মাতব্বরি করতে যাচ্ছ কেন? এ-কি যা-তা ব্যাপার মনে করেছো তোমরা ! দু'ভাই আলাদা হচ্ছে—সমান সমান ভাগ হবে। নইলে সারা জীবন তো পাশাপাশি বাস করতে হবে, এক জনকে ঠকালে অন্যজনের প্রতি তার রাগ থেকে যাবে। অতএব, কোনদিন দু' পরিবারের মধ্যে শান্তি থাকবে না। নিয়ামত ছেলে মানুষ, বৌটা কচি মেয়ে ; তাদের তোমরা বোকা পেয়ে পরিছনের কথা মত ভাগ করে তাদের ঠকাতে যাচ্ছো ! সেটি কিন্তু এই ময়নার মা বেঁচে থাকতে হচ্ছে না। আজকে ভাগাভাগি হবে না। মিয়া সাহেব বাড়ীতে আসুক, কালকে ডেকে ভাগ করে নিও। এ-সব ব্যাপার শুধু আত্মীয় নিয়ে সমাধা করা যায় না, কেননা, আপন জনের প্রতি সবারই প্রাণের টান আছে। তাই কেবল মাত্র তাদের নিয়ে করলে বিষয়টা মীমাংসা হওয়ার পরিবর্তে গোলমালের সৃষ্টিই হয়।

ময়নার মা-র কথা শুনে উপস্থিত সকলে আর কিছু বলতে সাহস করলো না। কেননা, তার কথাটা যুক্তি সঙ্গত কি-না! কেবল মাত্র আত্মীয়দের উপরে বিষয়টা ছেড়ে দিলে যে পক্ষের পয়সাওয়ালা আত্মীয় আছে, সেই পক্ষ জিতবে। ফলে এই পয়সাওয়ালার প্রতি—যার পয়সা নেই, তার মনে মনে একটা হিংসা ভাব থেকে যাবে। এই ঠকানোর জন্য প্রতিশোধ নিবার জন্যে দিনের পর দিন সুযোগ খুঁজতে থাকবে। ব্যাপারটা উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনেরা বুঝতে পেরে আর কোন উচ্চবাচ্য করলো না; তারা মিয়া সাহেবের আসবার প্রতীক্ষায় থাকলো! পরিছন জানে—মিয়া সাহেবের হাত দিয়ে যদি ভাগাভাগিটা হয়ে যায়, তা' হলে তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস-পত্র সে কিছুই পাবে না। তাই সে বার বার তার স্বামী আর বাপকে ধমক দিতে লাগলো। তোমরা সব বোকা হয়েছে নাকি! ময়নার মা কার কেডা? তার কথামত আজ ভাগ হবে না—কাল হবে? স্বামীর উপরে খুব করে গাল ঝাড়তে লাগলো—যতসব ছোট লোকের দল! আমার নিয়ে এসে হাড় গোস্ত জ্বালিয়ে ছাড়লো! আজ আবার আমার বাপের ডেকে নিয়ে এসে তাকে অপমান করছো! আর থাকবো না তোমার বাড়ী। তোমার মত অলক্ষুণে বোকা মিনসের ঘর করবার চেয়ে বাপের বাড়ী বাঁদীগিরি করা অনেক ভাল। আসমত তার স্ত্রীর স্বভাব জানে; কিন্তু কোন দিন তার এই বদ্ স্বভাবের জন্যে কিছু বলেনি। আজ স্ত্রীর গালাগালি শুনে তার বড় রাগ হল। তার বাপের সামনে স্বামীর অপমান! দাঁতে দাঁত চেপে আসমত স্ত্রীর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার দু' চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুতে লাগলো। ময়নার মা আসমতকে কিছু না বলতে দেখে বললো—তা' নবাবের ঝি গরীবের বাড়ী হাড় ভাঙ্গতে না এলে পারতে! কে তোকে আসতে কইছিল! জীবন-ভর বাপের বাড়ী ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে আরামে দিন চালিয়ে দিতে পারতিস্। বাপের সামনে স্বামীকে যে গাল দেয়, তার মুখে আগুন। আর যে বাপ মেয়ের এহেন অপরাধ চোখ বুঁজে গেলে, সে বাপের হাজার বার ধন্যিবাদ।

মেয়ের ব্যবহারে সম্মান থাকবে না এই ভয়ে আসমতের শ্বশুর 'আস্‌ছি' বলে পিছটান দিল, আর এলো না। একেবারে সোজা বাড়ী চলে গেল।

ময়নার মা বললো—দেখলিরে পোড়ামুখি! তোর গুণের জ্বালায় জন্মদাতা বাপও নিজের মান রাখতে সরে পড়লো। এমন মেয়ের মুখে ছাই পড়ুক। সেদিন আর ভাগাভাগি হল না। যারা এসেছিল, সকলে বাড়ী চলে গেল। ময়নার মা-ও শেষ বারের মত বার কয়েক চীৎকার করে চলে গেল। সে-রাতে গ্রামের সবায় দু'টো মুখে দিয়ে ঘুমুতে পারলো; কিন্তু এ-বাড়ীতে রান্না-বান্নাও হল না, এমন কি কেউ এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত স্পর্শ করলো না। যার সেই ঘরের হাতনেয় কেউ মাথায় হাত দিয়ে, কেউ দু' হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে বসে রাত কাটিয়ে দিল। কারও চোখে এক ফোঁটা ঘুমও এলো না। দারুণ চিন্তার মধ্যে দিয়ে রাত কেটে গেল। সকালে আসমত যেয়ে মিয়া সাহেবকে এ-সব কথা খুলে বললো। মিয়া সাহেব এ-সব কথা শুনে বললেন—তোরা পৃথক হয়ে যাবি, তা' তো ভাল কথা! ভাইয়ে ভাইয়ে এক সংসারে থেকে রাতদিন ঝগড়াঝাটি না করে যার সেই আলাদা হয়ে কাজকর্ম করে খাগে! যার যার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর। মনে করিস কেউ কাউকে খেটে খেতে দেবে না। একদিন যখন আলাদা হতে হবে, তখন দু'দিন আগে হওয়াই ভাল। এখন অল্প বয়স, দু' পয়সা আয় করবার সময়; একজন আর একজনের ভরসা করে থাকলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হবে।

মিয়া সাহেব নিজে যেয়ে সমস্ত কিছু সমান ভাগে ভাগ করে করে দিয়ে এলেন। আজ ভাগ করবার সময় পরিছন কিন্তু একটা কথাও বলতে সাহস করলো না। জমা-জমি; ঘর-বাড়ী, গরু বাছুর, হাঁস-মুরগী ও কাঁথা-বালিশ, টাকা পয়সা যা কিছু ছিল, সব সমান দুটো ভাগ হল। তবে টাকা পয়সা আসমতের কিছু বেশী দিলেন। মিয়া সাহেব নিয়ামতকে বললেন—আসমতের খাওয়ার লোক বেশী, আর তোমরা তো মাত্র দু'টো মানুষ; তাই তোমার চেয়ে ওকে একশো' টাকা বেশী দিলাম। ওর বেশী দিলাম বলে তুমি মন খারাপ করো না, মন দিয়ে কাজ কর। পরিশ্রম করে দেখ—হয়তো তোমার অবস্থা ভাল হবে।

সখিনার আজও বেশ মনে আছে—মিয়া সাহেব যখন সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—এই ভাগাভাগির ব্যাপারে তোমাদের কারও কিছু বলবার আছে? সবায় বলেছিল—কিছু বলবার নেই; কিন্তু তার জা' কোন কথা

বলেনি। মিয়া সাহেব তার কাছে অন্ততঃ পাঁচবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—যদি কিছু বলার থাকে, তা'হলে এখনও বলতে পার। তবু সে কথা কয়নি। তখন তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। গম্ভীর মিজাজে তার ভাসুরকে লক্ষ্য করে বললেন যদি এ নিয়ে আর কোন দিন ভাইয়ে-ভাইয়ে বৌতে-বৌতে গোলমাল হয়, তা'হলে যার অন্যায় পাওয়া যাবে, তাকে কিন্তু কিছুই দেওয়া হবে না। মিয়া—সাহেব চলে গেলেন। ময়নার মা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। সে জানে মিয়া সাহেবের ন্যায় অন্যায় বুঝবার শক্তি আছে। আর তিনি যা' করবেন, তার উপরে কিছু করবার ক্ষমতা কারও নেই। তিনি যখন চলে গেলেন, তখন সে পরিছনকে লক্ষ্য করে বললো—কাল যে খুব গলাবাজি করলে, আজ তো একটি কথাও বলতে শুনলাম না। যেমন কুকুর--তেমন মুগুর না পেলে সোজা হয় না। সখিনার হাত ধরে টেনে নিয়ে বললো—এমন করে খ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে! কালকের রাত উপোস গেছে, আজও আবার উপোস থাকতে চাস নাকি! নে, তোর জিনিস-পত্রগুলো ঘরে তোল। ময়নার মা নিজেই কোমরে কাপড় জড়িয়ে হাড়ি-কড়াই থালা-বাসন লেপ-কাঁথা সখিনার ঘরে যেখানে যেমনটি মানায়, সেখানে ঠিক তেমনভাবে সাজিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে গেল।

সেই পৃথক হওয়ার দিন থেকে প্রায় এক বছর কেটে যায়, তবু পরিছন সখিনার সাথে কথা বলেনি। অবশ্য সময়ে অসময়ে তার জা'র সাথে কথা বলেছে এবং কোন কিছু করবার আগে তার জা'-কে ডেকেছে; কিন্তু কোনদিন পরিছন তার সাথে কথা বলেনি বা তার ডাকে সাড়া দেয়নি।

॥ ১১ ॥

প্রায় এক বছর পর একদিন আকস্মিকভাবে পরিছন সখিনার সাথে কথা বললো। তার কোলের এই মেয়েটি তখন পেটে। এর আগের দু'টি বাপের বাড়ীতে প্রসব করেছে! এবার আর বাপ মা নিয়ে গেল না। সেই যে আলাদা হওয়ার আগের দিন তার বাপ পালিয়ে বাড়ী গিয়েছিল, সেদিন থেকে আর একদিনও মেয়ের বাড়ীতে আসেনি। তাই মেয়ের অন্তঃসত্বার খবর তারা রাখে না। পরিছনের পীড়াপীড়িতে আসমত অবশ্য দু দিন যেয়ে বলে এসেছিল। শ্বশুর বলেছিল—যাব। 'যাব' বলে আর যায়নি। বাপ যখন নিয়ে গেল না, তখন পরিছন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে তার স্বামীকে বললো—তুমি নিয়ে চলো! আসমত বললো—তোমার বাপ নিয়ে গেল না। আমাকে রেখে আসবার কথাও বললো না; যদি বলতো আমার যাওয়া খুব অসুবিধে, তুমি বাবা ওকে একটু রেখে যেও। তা'হলে না হয় আমি রেখে আসতাম। তোমার বাপ আসবে বলে যখন এলো না, তখন বুঝতে হবে তাদের নিয়ে যাওয়ার মত নেই। পরিছন তখন স্বামীর হাত দু'টি জড়িয়ে ধরে বললো—তবে তুমি এক কাজ করো মাকে নিয়ে এসো। পরিছন আজ পর্যান্ত কোনদিন স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরে কাকুতি মিনতি করেনি। আজ এই প্রথম, তা-ও আবার বিপদে পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর সংসার হাসি-কান্না দিয়ে গড়া। কিন্তু আসমত এ যাবত স্ত্রীর ব্যবহারে কেবল অন্তরে অন্তরে কেঁদেছে, হাসেনি কোনদিন। হয়তো হাসবার অনেক সুযোগ এসেছে, কিন্তু স্ত্রীর সামনে হাসতে সাহস হয়নি কোন দিন। আজকের ব্যবহারে আসমত না হেসে আর পারলো না। স্বামীর মুখে হাসি দেখে পরিছন কেঁদে ফেললো। বললো—তুমি হাসছো! বাড়ীতে একটি মানুষ নেই, বাপ-মা নিয়ে গেল না, সময়ও আর বেশী নেই, আমি চিন্তাই চিন্তাই বাঁচছিনে, আর তুমি হাসছো! তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—তুমি যাও।

—মা যদি আসতে না চায়?

—তুমি বাড়ী থেকে গাড়ী নিয়ে যাও। গাড়ী নিয়ে গেলে না এসে পারবে না।

—দু' দুবার তোমাকে নিয়ে যাবার কথা বলে ফিরে এসেছি, তারা 'আসবো' বলে এলে না, এবারও তো 'যাব না' বলে ফিরিয়ে দিতে পারে। মেয়ের প্রতি যদি মা বাপের প্রাণের টান থাকতো, তা'হলে নিশ্চয় প্রথম দিন সংবাদ পেয়েই নিয়ে যেত।

—হয়তো কোন রকম অসুবিধে হয়েছে, তা' না হ'লে দু'টো ছেলে-মেয়ে হল—তখন নিয়ে গেল, আর এখন নিয়ে যাচ্ছে না কেন!

—আসছে না তোমার গুণের জন্যে।

—আমি যদি কোন অন্যায় করে থাকি, তা'হলে মাকে নিয়ে এসো মাফ চেয়ে নেব।

স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত আসমত বাড়ী থেকে দুই গাড়ী নিয়ে গেল। তাকে গাড়ী নিয়ে যেতে দেখে তার শাশুড়ী রীতিমত অবাক! তার শাশুড়ী প্রথম মনে করেছিল তার মেয়ে এসেছে; তাই ঘরের হাতনের চুপচাপ বসে থাকলো। তারপর যখন দেখলো—মেয়ে আসেনি, তার জামাই আর নাতি ছেলেটা এসেছে, তখন হাতনেয় থেকে নেমে যেয়ে বাইরে খামারের দিকে গেল। গাড়ী নামালে নাতি ছেলেকে কোলে নিয়ে দু'গালে দু'টো চুমো দিয়ে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল।

আসমত গরু দু'টি তার শ্বশুরের গোয়ালে বেঁধে বাড়ীর মধ্যে যেয়ে শাশুড়ীকে সালাম জানাল। তারপর তারা যে তাকে নিতে এসেছে, তা' জানালো। শাশুড়ী সে কথা শুনে তো অবাক হয়ে গেল। না-বলে না-কয়ে গাড়ী নিয়ে এসেছে নিতে! এ কেমনতরো ব্যাপার! শাশুরীকে চুপ করে থাকতে দেখে আসমত বললো—দেরী করবেন না, তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিন; আজকেই যেতে হবে।

—তা' কি হয় বাবা! আমি কেমন করে যাব! তোমার শ্বশুর বাড়ীতে নেই।

—কোথায় গেছে?

—কাল বিকেলে গেছে কোথায় যেন—মেয়ে দেখতে।

—কার জন্যে ?

—ও-পাড়ার আমির মুন্‌শীর বড় ছেলের জন্যে।

—আজ বাড়ী আসবে না ?

—তা' কি জানি বাবা! বুড়ো হয়ে গেছে, কাজ-টাজ তো করতে পারে না! তাই ঘরের টান খুব কম। কোথাও গেলে তাড়াতাড়ি ফিরতে চায় না।

—আপনি গুছিয়ে গাছিয়ে নিন, তিনি এলে বলে-কয়ে যাওয়া যাবে।

—আমার বাবা আর গুছাতে সময় লাগবে না ; তোমার শ্বশুর আসুক, যেতে বললে—যাব। সংসারে মোটে দু'টো মানুষ। কোন রকম হাঙ্গামা নেই, তাই জিনিস-পত্র যা' আছে, সব গুছানোই রয়েছে। তোমরা পা' ধুয়ে বসো—আমি খাবার জোগাড় করিগে।

আসমতের শাশুড়ী অর্থাৎ জয়তুন বিবি জামাইকে এক বদনা পানি ঢেলে দিয়ে পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী-সম্পর্ক এক দেবর পো'কে ডেকে নিয়ে এলেন। ঘর থেকে খ্যাপলা জালখানা বের করে তার হাতে দিল। বাড়ীর পিছনের কুয়ো থেকে গলদা চিংড়ী ধরলো আধাসের টাক। আর পশ্চিম পাশের পুকুর থেকে প্রায় সেরখানি মত একটা কাতলা মাছ ধরলো। জয়তুন বিবি মাছ নিয়ে বাড়ী এসে রান্না ঘরে পেটের মধ্যে ঢেকে রাখলো! সকালের পান্তাভাত দুটো হাঁড়িতে ছিল, তাই এক মুঠো উঠোনের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। মোরগ-মুরগী যেখানে যা' ছিল, সব ছুটে এলো খেতে! জয়তুন বিবি তখন হাতে অল্প দু'টো ভাত নিয়ে টুকরাটা একহাতে উঁচু করে ধরে তার মধ্যে ভাত ছিটিয়ে দিয়ে তিঁ তিঁ করে ডাক দিল। অমনে একপাল বাচ্চা এসে জড় হল। তার মধ্যে আর দু'টো ভাত ছিটিয়ে দিয়ে 'আয় আয়' করে বার কয়েক ডাক দিলো।

পিছন দিক থেকে বড় ছাড় দেওয়া মোরগটা ছুটে এসে বাচ্চা-গুলোকে ঠুকিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে খেতে লাগলো। জয়তুন বিবি আস্তে আস্তে টুকরাটা ছেড়ে দিলো। মোরগটা ঢাকা পড়ে ঝট্ পট্ করতে থাকলো। টুকরার উপরে একটা কাঠ চাঁপা দিয়ে রেখে সে ঘরে গেল। দু'টো চিড়ে ভিজিয়ে একটা নারকেল ভেঙ্গে কুরনিতে কুঁরে দুধ-গুড় দিয়ে জামাই, নাতি-

ছেলেকে খাওয়ালো। ঘরের মধ্যে খাটের উপর বিছানা করে দিয়ে বললো—তোমরা শুয়ে থাক, আমি যাই—রান্না করিগে!

জয়তুন বিবি পাড়া থেকে মোরগটা জবাই করে নিয়ে এলো। একা মানুষ, সংসারে একটু সাহায্য করবারও মানুষ নেই। তাকে সাহায্য করবার দরকারও হয় না। তবে আত্মীয়-স্বজন এলে একা সব কাজ করতে একটু কষ্টভোগ করতে হয়। মাছ কুটলো, তরকারি কুটলো, মোরগটা ঝেড়ে-কুটে রান্না করলো। তাঁর রান্না শেষ হতে বেলা বেশ খানিক গড়িয়ে গেল। রান্না-ঘরে সব ঢেকে ঢুকে রেখে ঘরে যেয়ে জামাইকে ডাকলো। বাটিতে করে তেল এনে দিয়ে বললো—যাও, গোছল করে এসো, আমার ভাত হয়ে গেছে। আসমত ঘুমিয়েছিল, আড়া-মোরা ছেড়ে উঠলো। ছেলেকে ডাকলো। বাপে ছেলেয় পুকুর থেকে গোছল করে এলো। জয়তুন বিবি তাদের খাইয়ে দাইয়ে বিশ্রাম করতে বলে খেতে বসলো।

আসমত খাওয়ার পর এক ঘুম দিয়ে উঠে দেখে বেলা আর বেশী নেই। তাড়াতাড়ি বাইরে নেমে এসে তার শাশুরীকে ডাকলো। জয়তুন বিবি প্রতিবেশিনী জা'র সাথে কথা বলছিলো, জামাইয়ের ডাক শুনে ছুটে এলো।

—কি বলছো বাবা?

—বেলা চলে গেল, এখনও জামাই বাড়ী এলো না; আমার তো থাকা অসুবিধা।

—কি করবো বাপ! বাড়ী না এলে তো আমি যেতে পারিনে, আজকের দিনটা না হয় থাক, বাড়ী আসুক, দেখি কি বলে। না হয়, কালকে গেলে হবে। সেদিন সন্ধ্যার পর আসমতের শশুর মিয়া রাজ মণ্ডল বাড়ী এলেন। উঠোনে পা দিয়ে—'কই, কনে গেল' বলে ডাক দিলেন। জয়তুন বিবি রান্না-ঘরে ছিলেন, স্বামীর ডাকে ছুটে রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে দেখেন, স্বামী থর্ থর্ করে কাঁপছেন। 'হলো কি! কাঁপছো কেন'—বলে গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন! ও-আল্লা—একি! জ্বরে তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে। শীগ্‌গীর ঘরে উঠো, বিছেন পেড়ে দিই—শুয়ে পড়। তিনি ঘরে যেয়ে বিছেন কাঁথা পেড়ে দিলেন। মিয়ারাজ মণ্ডল যেয়ে ধপাস করে শুয়ে পড়ে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলেন। গায়ের উপর খান চারেক কাঁথা আর একখানা লেপ

চাপিয়ে দিলেন। তবু কাপুনী কমলো না। তারপর আরও একখানা লেপ দিয়ে চেপে ধরলেন, তবু কাপুনীর শেষ নাই। জাহানটা লেপ কাঁথা ঠেলে ফেলে দিয়ে উপর দিকে যেন বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। জয়তুন বিবি তার নাতি-ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্বামীর গায়ের উপর চেপে ধরলেন। তবু যেন কাঁপুনি থামে না। কিছুক্ষণ পর জয়তুন বিবির হঠাৎ খেয়াল হল—তাইতো! মাথায় পানি না ঢাললে মাথা ঠাণ্ডা হবে না! তিনি নাতিকে তার নানার গায়ের উপর চেপে থাকতে বলে দৌড়ে রান্না-ঘরে গেলেন। এক কলসী ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এলেন। আসমত একখানা কলাপাতা কেটে নিয়ে এল। জয়তুন বিবি কলা পাতাখানা স্বামীর মাথার নীচে গুঁজে দিয়ে নীচে একখানা গামলা পেতে মাথায় পানি দিতে বসলেন। আসমত কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে শাশুড়ীর কথামত পাশের গ্রামের হারান কবিরাজকে ডাকতে গেল। যেয়ে দেখে কবিরাজ মহাশয় বাড়ীতে নেই। তিনি কোথায় রোগী দেখতে গেছেন। আসমত বৈঠকখানায় বসে বসে আধা বাণ্ডেল বিড়ি ধ্বংস করলো, তবু কবিরাজ মহাশয়ের দেখা নেই। সে অস্থির হয়ে উঠলো। বৈঠকখানা থেকে নেমে পাঁচিলের দরজার কাছে যেয়ে বার কয়েক কবিরাজ মহাশয়ের নাম ধরে ডাক দিল।

কবিরাজ মহাশয় কোথায় রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। বাড়ী এসে বৈঠকখানায় না ঢুকে সোজা বাড়ীর মধ্যে চলে যান। তার স্ত্রী বসেছিলেন হাতনের তক্তপোষের উপর। স্বামী ঘরে উঠলে বললেন—তোমাকে কে যেন ডাকতে এসেছিল।

—কে ?

—তাকে আমি চিনিনে। তোমার নাম ধরে ডাকলো—আমি বাড়ীর মধ্যে থেকে বললাম—তিনি বাড়ীতে নেই, আপনি বসুন—এখনই আসবেন।

—কতক্ষণ হবে ?

—তা' প্রায় ঘণ্টা দুই হবে।

—কই, বৈঠকখানায় তো কোন আলো দেখতে পেলাম না।

—তা'হলে হয়তো তোমার অপেক্ষায় বসে থেকে চলে গেছে।

—আচ্ছা, একবার দেখে আসি।

—তোমাকে আর দেখতে হবে না। এত রাতে কেউ আবার অন্ধকারে বসে থাকে নাকি?

—তার কাছে আলো ছিল?

—ছিল বলে মনে হয়।

—তা'হলে নিশ্চয় চলে গেছে। কেননা, আমি তো বৈঠকখানার পাশ দিয়েই এলাম। থাকলে নিশ্চয় দেখতে পেতাম। আর আলো যদি না-ও থাকে, তবু একটা লোক বসে থাকলে—সাড়া তো পাওয়া যাবে!

—যাকগে যাক, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়।

—যাবে তো গিন্নী! তুমি বুঝতে পারছো না যে, লোকটা চলে যেয়ে আমার কত টাকা মার গেল!

—সে তোমার কি ক্ষতি করলো?

—ক্ষতি করেনি! বাড়ীতে ডাকতে এসেছে যখন, তখন নিশ্চয় 'সিরিয়াস কেস।' আরো রাতের বেলায়! আমি দশ টাকা ফি-র কম যেতাম মনে করেছ! আর ঔষধের দাম তো আলাদা।

—তুমি বল কি! একজন মরে যাচ্ছে—তুমি তার বাড়ী যাবে তাকে দেখতে; ঔষধের দাম নেবে, আবার যাবার দরুণ দশটা টাকাও নেবা নাকি?

—বটে। এমন করে না-ই বা যদি নেব, তবে এ দালান-কোঠা কেমন করে হল—আর ছেলে দু'টোই-বা বিদেশে থেকে পড়ছে কেমন করে!

—ও-মা সেকি কথা! তুমি এমন করে টাকা রোজগার করে ছেলেদের পড়াচ্ছো! এমন পড়ানোর মুখে ছাই! একজন বিপদগ্রস্থ রোগীর সেবা করাই মানুষের ধর্ম নয় কি! আর তুমি সেবা করতে যেয়ে লুঠ করে নিয়ে আস!

—আরে, সারা জীবন ধরে কেবল সেবা-করে আসছি। কত রোগী আমার হাতে ভাল হয়েছে, আর কত রোগী 'মরবো' 'মরবো' করে মরতে না পেরে আমার হাতে এসে সময় মত যমের বাড়ী পৌছে গেছে! আর তুমি বলছো কি-না আমি সেবা করিনে!

—তোমার এমন সেবার মুখে আগুন!

—কেন?

—এ তোমার কেমন ধরণের সেবা করা বলো ! সেবাই যদি করবে, তবে পয়সা নিবে কেন রোগীর কাছ থেকে ?

—আমি যে পরিশ্রম করবো, তার পারিশ্রমিক নেব না ?

—সে-তো তোমার ঔষধের দাম নিলেই হয়ে যায়। যত রাজ্যির গাছ গাছড়ার শিকড়, বড়ি আর হালুয়া বানাতে কতই বা খরচ ! তাই বিক্রী করলেই তোমার পারিশ্রমিক পেয়ে যাও। 'উপরি' কেন আবার ?

—ও-কথা তুমি বুঝবা না গিন্নী। ভাত নিয়ে এসো, খেয়ে শুয়ে পড়ি।

কবিরাজ-গিন্নী ঘরের শিকল খুলে স্বামীর জন্যে বেড়ে রাখা ভাত তরকারি নিয়ে এসে খেতে দিলেন। গিন্নী ভাতে হাত দিয়ে দুঃখ করে বললেন—সারাটা জীবন কেবল 'পয়সা' 'পয়সা' করে ছুটে বেড়ালে ! সময় মত ভাত খাওয়া, স্নান করা, একটু বিশ্রাম করা তোমার ভাগ্যে সইলো না। পয়সার জন্যে সেই সন্ধ্যে বেলা বেরিয়ে যেয়ে এই রাত দুপুরে বাড়ী এসে ঠাণ্ডা ভাত খেতে হচ্ছে।

—তা' হোকগে। যাক, দিন রাত যাচ্ছে তো কেটে।

॥ ১২ ॥

প্যাড়া গাঁ। খুব নিকটে বড় বাজার নেই। তাই বড় ডাক্তার নেই। এই গ্রামের পাশে বেঁদে পুকুর গ্রাম। এখানে সপ্তাহে দুটো হাট বসে। গাঁয়ের বাজার! খুব বেশী জমকালো নয়। এখানে অল্প মূল্যের কুমা জিনিষপত্র বিক্রী হয়। এই হাটের দক্ষিণ দিকে দু'খানা চাল দিয়ে রবিন সরকার একটা ডিস্পেনসারী খুলে আজ প্রায় বছর পনের-ষোল চিকিৎসা ব্যাবসায় করছেন। তিনি এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। অবশ্য কোন পাশ করা ডাক্তার নন। গাঁয়ের বাসিন্দা বলতে সবায় মুর্খ। আশ-পাশ কয়েক গ্রামের মধ্যে হয়তো দু' একজন দু' একপাতা লেখা-জানা লোক আছেন। তবে কয়েক গ্রামের মধ্যে কেবল হারান কবিরাজের দু'টি ছেলেই বেশী জানে। কমলাপুরের গোঁড়া বাসিন্দা, তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ও এই কবিরাজী ব্যবসায় করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ এ ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি। আশ-পাশের কয়েক গ্রামের রোগী সব তাদের হাতে চিকিৎসা হত। তাঁদের উন্নতি না হওয়ার কারণ, তাঁরা পারিশ্রমিক নিতেন খুব কম। কিন্তু হারান বাবুর রীতি হল অন্য রকম। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এ তল্লাটের সমস্ত রোগী যখন তাঁদের হাতে, তখন ইচ্ছে মত এদের কাছ থেকে বেশ দু' পয়সা রোজগার করা যায়। তিনি যখন প্রথম কবিরাজী ব্যবসায় হাত দেন, তখনই বুঝতে পেরেছিলেন—দেশ আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে চলে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এ্যালোপ্যাথিকের কাছে এ-সব কবিরাজী হোমিওপ্যাথী টিকবে না। অতএব, এ বংশের ভাবী বংশধরদের জন্য অন্য পথ তৈরী না করলে এদিকে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। তারপর বছর পনের ষোল আগে যখন রবিন সরকার বেঁদে পুকুরিয়ার হাটে এসে ডিস্পেনসারী খুলে বসলেন, তখন থেকে তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন পয়সা জমা করবার জন্যে। আশে-পাশে সবার মনে ভয় ধরিয়ে দেন। অনেক মিথ্যে গুজব রটিয়ে রবিন সরকারের

ডিস্পেনসারীতে না যাওয়ার জন্য হুশিয়ারী করে দেন। এর আগে গ্রামের কেউ তেঁতো ঔষধ দেখেনি, কেউ খায়নি। যে-সব রোগী একবার সরকারের কাছে একদাগ ঔষুধ খেয়েছে, তারা 'ওয়াক্-থু' বলে গলধঃকরণ ঔষধ বমি করে ফেলে দিয়ে ছুটে যায় কবিরাজ মহাশয়ের কাছে। যেয়ে একেবারে কেঁদে ফেলে—কবিরাজ মশায় শিগ্গী বাঁচান। সরকার মশায় আমাকে একেবারে মেরে ফেলেছেন।

হারান কবিরাজ কথা বলেন না। গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন। রোগী একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। কাকুতি মিনতি করে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে। তখন কবিরাজ মহাশয় মুখ খোলেন। শাসনের ভঙ্গিতে বলেন—আমার এখানে কেন! যা - তোদের সরকারের কাছে। কতবার না বলেছি, ওর কাছে যাসনে। তা-ও তো তোরা শুনবিনে। মনে করেছিস ও নতুন এসেছে, নিশ্চয় কোন ভাল ডাক্তার; অল্পেতে রোগ সারবে। ওরে বোকার দল! তোরা তা' তো বুঝবিনে যে, ও রোগ সারাতে আসেনি, বাড়াতে এসেছে। না ঠেকে তো শিখবিনে। গিইলি তো চিকিৎসা হতে, আবার আমার কাছে কেন! রোগী আরও ভেঙ্গে পড়ে—কবিরাজ মশায়! আমার কি হবে! গাল-গলা সব তিঁতো হয়ে গেছে, শিগ্গী ঔষধ দিন; নইলে মরে যাব।

—ওরে, তোরা মরবি বলেই ওর কাছে যাস।

—আর যাব না, কবিরাজ মশায়! এই 'কাঁরে' কাটছি—আর যাব না। আজকেও কি আমি যাই! আসছি আপনার কাছে—সরকার মশায়ের সাথে দেখা। বলেন, ওরে আমার কাছে ভাল অষুধ আছে। অল্প পয়সা লাগবে আর জ্বরও তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

—পয়সা কম লাগবে সেই লোভে দৌড়ে গেলি! কিন্তু এবার যে পয়সা বেশী লাগবে!

—তা' লাগুক কবিরাজ মশায়, আপনি আমায় অষুধ দিন। যে বিষ খাইয়ে দিয়েছে, গাল-গলা সব তিঁতে হয়ে গেছে। এমন যম এসে বসেছে হাটখোলায়, তা কি আর আমি জানি! ও মানুষ তো নয়—নির্ঘাত যম।

—খেয়েছিস নাকি কিছু?

খেয়েছিলাম, তা' বমি করে ফেলে দিয়েছি। ফেলে তো দিয়েছি, কিন্তু ন্যাড়ী ভুড়িতে যেগুলো লেগে রয়েছে সে গুলো ?

রোগী আরও ভেঙ্গে পড়ে। জীবনের প্রতি মায়া, বাঁচবার জন্যে সে কি অন্তর্দ্বন্দ্ব। রোগী বলে—যত টাকা লাগে, দেব কবিরাজ মশায় ; আপনি ভাল করে দিন।

কবিরাজ মহাশয় হাত ধরে নাড়ী দেখেন, পেট টিপে দেখেন, চোখের পাতা টেনে দেখেন, জিভ দেখেন তারপর ঔষধ দেন। দশ টাকা বিল কষেন। রোগী দু'টাকা দিয়ে বলে—বাকি টাকা কাল দিয়ে যাব।

কবিরাজ মহাশয় হা-হা করে ওঠেন। বলেন—কালকেও তো ঔষধ লাগবে, কালকের দাম আবার কবে দিবি ?

—গরীব মানুষ ! টাকা পয়সা তো হাতে নেই, দু'টো ছাগল আছে, একটা বেঁচে টাকা সব দিয়ে দেব।

—আরে ছাগল বেঁচে টাকা দিবি ! তা' অন্য যায়গায় না বেঁচে আমারে দিস। আমি ঔষধের দাম শোধ করে নেব।

—আপনি নেবেন ?

—নেব না কেন !

—তা'হলে কালকে নিয়ে আসবো।

কবিরাজ মহাশয় টাকা দু'টি পকেটে রাখতে রাখতে বলেন—তা' আসিস। রোগী হালুয়া আর কালো বটিকার মোড়া জামার পকেটে পুরে নিয়ে চলে যায়। পরদিন ছাগলের দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসে। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দেন। দাম কষেন ; ছাগলের ন্যায্য মুল্য থেকে পাঁচ টাকা দর ধরেন। তার থেকে নিজের পাওনা টাকা বাদ দেন। বলেন—তোর রোগ সারতে এখনও অনেক দেরী ; রোজ আসিস, এখনও তো ঔষধের দরকার। টাকা আমার কাছে থাক, তোকে দিলে খরচ করে ফেলবি। রোগী মাথা নাড়িয়ে ঔষধের মোড়া গাঁটে গুঁজে বাড়ী চলে যায়। রোগী রোজ সকালে যায়, আর ঔষধ নিয়ে বাড়ী আসে। রোগ ভাল হয়ে গেলেও টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত কবিরাজ মহাশয় বলেন—তোর বাইরে রোগ ভাল হয়েছে রে ! এখনও অন্তরে রোগ আছে। তারপর আর দু'দিন ঔষধ দিয়ে বলেন—আর

তোর আসা লাগবে না। সব ভাল হয়ে গেছে। তোর বরাত ভাল; একটা ছাগলের টাকায় রোগ ভাল হয়ে গেলো। সরকার মশায়ের কাছে যদি চিকিৎসা হতিস, তা'হলে দেখতিস—তোর বাড়ী যে ছাগলটা আছে, ওটাও চলে যেত।

সরকার মহাশয় আসবার পর থেকে কবিরাজ মহাশয় এমনিভাবে দু'হাতে পয়সা লুটতে লাগলেন। যে-সব জিনিস-পত্র রোগীর কাছ থেকে রাখবেন, তা'তে লাভ করবেন, আবার ঔষধে তো চৌদ্দ আনা লাভ। এই লাভেই তিনি দোতালা বাড়ী করেছেন, বড় ছেলেকে ওকালতি পড়াচ্ছেন; আর ছোট ছেলে আই, এস, সি, পড়ছে। তার ইচ্ছে ছোট ছেলেকে এম, বি, ডাক্তারী পড়াবেন।

একবার রবিন সরকার অনেক চিন্তা করে কোন উপায় স্থির করতে না পেরে তাঁর শহুরে বন্ধুদের নিয়ে এলেন। তিনি বুঝলেন, এই সব গণ্ড মুর্খ লোকগুলোকে বুঝিয়ে পথে ফিরাতে না পারলে তার ব্যবসায় চলবে না। তাঁরই চোখের সামনে দিয়ে হারান কবিরাজ দোতালা বিল্ডিং উঠালো। আর তিনি একজন ডাক্তার হয়ে ভাত পাচ্ছেন না! তিনি শহুরে বন্ধুদের নিয়ে কয়েক গ্রামের লোক নিয়ে এক জন-সভার আয়োজন করলেন। তাঁর এ-সব তোড়-জোড় দেখে হারান কবিরাজ বুঝতে পারলেন—তাঁর এ সভা করার কারণটা কি। তিনি আশেপাশে কয়েক গ্রামের মোড়ল মাতব্বরদের বেশ দু'পয়সা খরচ করে বাড়ীতে দাওয়াত করে খাওয়ালেন আর বুঝিয়ে দিলেন—রবিন সরকারের এই জন-সভায় কারণ কি! মোড়লরা মাছ মাংসে পেট বোঝাই করে বলে গেলেন—আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন কবিরাজ মশায়, দেখে নেবেন ও-ব্যাটার কেবল পয়সা খরচ করাই, সার হবে। দৌড়াদৌড়ি করে কিছু করতে পারবে না। আমরা বুঝিনে তার মতলবখানা কি! আপনার চৌদ্দ পুরুষ ধরে কবিরাজী করছেন, কোনদিন কেউ আপনাদের মন্দ বলতে পারলো না, আর আজ ও কিনা দু' পাতা ইংরেজী পড়ে কোথা থেকে এসে আসন গেড়েছে। এবার আপনার নামে মন্দ রটিয়ে শোবার যায়গা করতে চাচ্ছে—সে কি আমরা বুঝতে পারিনি বলতে চান? ব্যাটার সব কিছু আমরা পণ্ড করে দেব। সেদিন বিকেলে হাটখোলার পূর্বপাশে 'স্কুলের সামনে যে

বিরাট মাছ পড়ে আছে, সেই মাঠে দলে দলে লোক এসে জমতে লাগলো। আর না জমে যাবেই বা কোথায়! সরকার মহাশয় মাইকের ব্যবস্থা করেছেন যে! এ-অঞ্চলের কেউ আগে মাইক দেখেনি। সামান্য দু' একজন যারা শহরে গেছে এবং বড় বড় জন-সভায় গেছে, সেখানে মাইক দেখেছে। মাইকে কথা বললে যে জোরে শোনা যায়—এ-কথা এ-অঞ্চলের লোক কেউ বিশ্বাস করতো না। শহরে দেখে এসে মাইকের জোর আওয়াজ শুনে বাড়ী এসে গল্প করলে সকলে অবাক হয়ে তা' শুনতো। তখন সবে মাত্র আমাদের দেশে মাইক ব্যবহার শুরু হয়েছে কিনা! তাই সব যায়গায় পৌঁছতে পারিনি। রবিন সরকার অনেক পয়সা ব্যয় করে শহর থেকে দু' দিনের জন্য মাইক ভাড়া করে এনেছেন। আগের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে আর আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আশ-পাশ কয়েক গ্রামে এই জন-সভার জন্যে ক্যান্‌ভ্যাস করেছেন। তাই দলে দলে লোকজন এসে স্কুলের ময়দান ভর্তি হয়ে গেল।

বিকেল পাঁচটায় সভা আরম্ভ হল। তাঁর চারজন শহুরে বন্ধু এসেছেন বক্তৃতা দিতে। প্রথমে একজন কোট-প্যাণ্টধারী শিক্ষিত ভদ্রলোক মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। সভাপতি আর উপস্থিত জন সাধারণকে সালাম জানিয়ে বললেন—ভাইসব, প্রাচীন যুগের অন্ধকার থেকে আমরা আজ আলোকের রথে চড়ে আগামী দিনের এক স্বপ্নময় মহালোকের দিকে যাত্রা করেছি। তবে রথে আমরা চড়েছি বটে, কিন্তু রথ চালাবার মত শক্তি-সাহস, জ্ঞান-বুদ্ধি আমাদের নেই। কেন নেই?—আমরা পুরানো দিনের মান্ধাতার আমলের সমস্ত ভাবধারা ত্যাগ করতে নারাজ। আজ বাইরের দুনিয়াই তাকিয়ে দেখুন—সে দেশের মানুষ কেমন নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে দেশকে কেমনভাবে সমৃদ্ধশালি করে গড়ে তুলেছে। আমরা পারিনে কেন?—আমাদের শিক্ষার অভাব। আমরা কোন্‌টা ভাল, কোনটা মন্দ,—তা' আজও বুঝতে শিখিনি।

ভদ্রলোক যখন এমনভাবে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছেন, তখন বিজন নগরের ডাক সাইটে মাতব্বর করিম সরদার বুঝতে পারলেন বক্তৃতা কোন্ দিকে যাচ্ছে। ভদ্রলোক বাইরে বাইরে বকে শেষ পর্যন্ত যে রবিন সরকারের কথা তুলবেন, তা' বেশ বুঝতে পারলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বললেন—শোনেন ভদ্র মহাশয়! এমন আজে বাজে বকবেন না। ভাল মন্দ

সম্বন্ধে আমি জানি কি-না, তা আপনি কি করে বুঝবেন! আর যদিই বা আমরা না বুঝি, তার জন্যে আপনার মাথা ঘামানো কেন! এই সব ভাল মন্দ ছাড়া যদি অন্য কোন কথা থাকে, তাই বলুন, নইতো তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ী চলে যান। করিম সরদারের কথা শেষ হতেই আরও দু'চার গ্রামের মাতব্বররা উঠে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে বললো —মশায় বোধ হয় সরকার মশায়ের চ্যালা! আমি কিছু বুঝিনে? ওনারা মনে করেছে গেঁয়ো চাষীর দল! ভেড়া বানিয়ে ইচ্ছামত ঘুরাবো, তা' হচ্ছে না বাছাধনেরা! আমাদের চৌদ্দ পুরুষেরা ঐ কবিরাজ মশায়দের কাছে চিকিচ্ছে হচ্ছে, আর ওনাদের বড়ি আর হালুয়া খেয়ে রোগ ভাল হয়ে যাচ্ছে, এ কথা এ-অঞ্চলের কে অস্বীকার করতে পারে? আর এই সরকার মশায় কোথা থেকে এসে বিষ মাখানো ঔষুধ দিয়ে লোকগুলো মেরে ফেলতে চায়। এর মধ্যে আর একজন মাতব্বর চীৎকার করে বললেন—ওরে, ওনার ঔষধে কি শুধু বিষ! শুনিছ নাকি ওর মধ্যে মদ, তাড়িও মিশিয়ে দেওয়া হয়, নইলে অতো তিঁতো আর গলা জলে নাকি! এ-কথা শুনে জনতার মধ্যে যারা সরকার মহাশয়ের কাছে চিকিৎসা হয়েছে, তারা সব উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আপনি ঠিক বলেছেন, ওনার ঔষধের মধ্যে মদ-তাড়ি দেওয়া। একজন বললো—আমারে একদিন এক দাগ খাইয়ে দিল, তাই খেয়ে গলা-পেট সব তিঁতো হয়ে গেল, শেষে আর বাঁচিনে। বমি করতে করতে কবরেজ মশায়ের কাছে যেয়ে হালুয়া খেয়ে তবে পেট-গলা ঠাণ্ডা হয়। ভাগ্যিস, কবরেজ মশায় সেদিন বাড়ী ছিলেন, নইলে আমি নির্ঘাত মরে যেতাম। দু'একজনের দু'এক কথায় আস্তে আস্তে বিরাট গণ্ডগোলের স্থষ্টি হল! শহর থেকে আসা ভদ্রলোকেরা অনেক চেষ্টা করে মাইকের সামনে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেও জনতাকে থামাতে পারলেন না। এক ভদ্রলোক দেখলেন যে, এরা সব কবিরাজ মহাশয়ের বশীভূত। অতএব, এদের সামনে কবিরাজ মহাশয়কে দাঁড় করাতে না পারলে গণ্ডগোল আরও বেড়ে যাবে। তিনি তখনই রবিন সরকারকে নিয়ে সাইকেল চেপে কবিরাজ মহাশয়কে ডাকতে গেলেন। ওদের সাইকেল চেপে চলে যেতে দেখে কয়েকজন লোক দৌড়ে যেয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালো; বললো—কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? আমাদের কেন ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে, কি উদ্দেশ্যে

তাই বলে তবে চলে যান; না বললে ছেড়ে দিচ্ছিনে। আস্তেআস্তে আরও একদল লোক তাঁদের ঘিরে দাঁড়ালো। সরকার মহাশয় মহা বিপদে পড়ে গেলেন। শহর থেকে বন্ধুদের ডেকে এনে এমনভাবে অপমান করাচ্ছেন, সেই লজ্জায় তিনি মাথা তুলতে পারলেন না। একজন বললো—কি হল সরকার মশায়! কথা বলছেন না কেন?

॥ ১৩ ॥

সরকার মহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—দেখুন, আমি যদি আপনাদের অন্যায়ভাবে ডেকে এনে অপমান করে থাকি, তা' হলে তার শাস্তি আমাকেই দিন। আমার বন্ধুদের কেন এর মধ্যে জড়াচ্ছেন?

সরকার মহাশয়ের কথা শেষ হতেই মিঠা বাড়ীর আর্জান সরদার লাফ দিয়ে উঠে বললো—আপনি কি আমাদের বোকা ঠাওরেছেন নাকি সরকার মশায়! আমরা বুঝিনে এসব চাল? আপনার বন্ধুদের কাছে এই কয়েক গাঁয়ের লোককে বোকা মূর্খ বলে পরিচয় দিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছেন আমাদের অপমান করাতে, আর তাঁদের এর মধ্যে জড়াবো না! এখন ব্যাপার-খানা কি! পালাচ্ছেন কোথায়?

সরকার মহাশয়ের সঙ্গী বন্ধুটি কথা বললেন—দেখুন আমরা কোথাও পালিয়ে যাচ্ছিনে—যাচ্ছি কবিরাজ মহাশয়কে ডাকতে।

—তা বেশ কথা! দায়ে পড়ে ভগবানের নাম! বলি এমন চালাকি কেবল আপনাদের শহরের লোক করতে জানে না, আমরাও জানি।

—কবিরাজ মহাশয়কে ডাকতে যাচ্ছি, তা' এর মধ্যে চালাকি কোথায় দেখছেন?

—চালাকি নয়! তাঁকে কি আগে এই সভার জন্যে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল?

—না।

—কেন?

—আপনাদেরও তো নিমন্ত্রণ করিনি।

—তবে এ দু'দিন মাইক নিয়ে সাত গাঁ ঘোরা হল কেন?

—কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীর সামনে দিয়েও তো মাইকে কথা বলা হয়েছে।

—তা' হলে কবিরাজ মহাশয়ের আলাদা কোন সম্মান নেই? পাঁচ জনের মত তাকে মনে করেছেন?

—না, মানে ··

—মানে কি?

—মনে করেছিলাম, তিনি হাজির হবেন।

—আচ্ছা, তাঁকে যখন আলাদাভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, তখন এই সভায় তিনি দু'এক কথা বলবার কেউ নন? তিনি আর সবার মত শ্রোতা? তা এতো হাজার হাজার শ্রোতা এসেছে তাঁর মত একজন বুড়ো মানুষ না এলেই বা আপনাদের কি! আপনাদের বক্তব্য আপনারা বলে যান, আমরা শুনে যায়, আমাদের ভাল লাগলে শুন্‌বো, না লাগলে শুনবো না।

সরকার মহাশয় আর তার বন্ধু এবার বিপদে পড়লেন। এমন একটা কথার উত্তর দিবার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিলেন না। আবার তাঁরা মনে করলেন এ-সময় যদি দু' এক কথা না বলি, তা'হলে সমূহ বিপদ। সরকার মহাশয় বললেন—দেখুন, আমাদের যে ভুল হয়ে গেছে, তার জন্যে ক্ষমা চেতে যাচ্ছি।

—ক্ষমা চেতে যাবেন, তা গোপনে গোপনে কেন? আমাদের সামনে চেতে হবে! চোরের মত পালিয়ে যেয়ে তাঁর কাছে মাফ চেয়ে ডেকে নিয়ে এসে আমাদের বুঝাবেন—তা' হবে না। আমাদের সামনেই তাঁর কাছে মাফ চেতে হবে, আর কি কারণে আজ সাত গাঁয়ের মানুষ এক জায়গায় ডেকে নিয়ে আসা হ'ল—তাও বলতে হবে।

সরকার মহাশয় বোবা বনে গেলেন। তিনি মনে করেছিলেন—মূর্খ চাষার দল, যা বলবো—তাই শুনে বাড়ী যাবে। এতো লোকের মধ্যে কিছু লোককে যদি বুঝিয়ে পথে আনতে পারা যায়, তা' হলে ভবিষ্যতে তারই জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু এই গেঁয়ো মূর্খদের মধ্যে যে প্যাচের মানুষও আছে, তা তিনি জানতেন না। জড়িয়ে যখন পড়েছেন, তখন যে কোন উপায়ে ছাড়াতে হবে তো। তিনি বললেন—কবিরাজ মহাশয়কে আমরা ডেকে নিয়ে আসি, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।

—বাহ! বেশতো আপনার কথা! কবিরাজ মশায়কে ডাকতে যেতে

পালিয়ে যান, আর আমরা হা-করে পথের দিকে তাকিয়ে থাকি! ডাকতে হয়, তা' হলে আমরাই ডেকে নিয়ে আসি।

সরকার মহাশয় দাঁতে জিভ্ কেটে বললেন—পালিয়ে আমরা যাব কোথায়! আর তা'ছাড়া ভুল যখন আমারই, তখন আমাকেই যেতে হবে। একবার না বলে ভুল করেছি, আবার দ্বিতীয় বার নিজে না যেয়ে লোক পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে আসা—আর তাঁকে অপমান করা সমান কথা। তিনি হয়তো বলতে পারেন—তা' আমাকে ডাকতে তোমাদের আসা কেন? যার দরকার, সেই তো আসতে পারতো।

আর্জান সরদারের মাথায় কি বুদ্ধি হল তা' তিনিই জানেন। তিনি বললেন—আচ্ছা, আপনারা যান। কিন্তু দেরী করবেন না মোটেও। দেরী করলে আপনার যে দু'জন বন্ধু এখানে থাকলেন, তাঁদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

সরকার মহাশয় 'এই এলাম' বলে সাইকেল চাপলেন। আর্জান সরদার যেয়ে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন—"ভাইসব!"—বলতেই জনতার দৃষ্টি মঞ্চের দিকে গেল। মাইকের সামনে আর্জান সরদারকে দেখে সকলে চুপ মেরে গেল। সাত গাঁয়ের প্রতিটি ছেলেবুড়ো যোয়ান সবায় চেনে এই আর্জান সরদারকে। তিনি যেমন একজন বড় ক্ষেত-খামারওয়ালা চাষী, তেমন টাকা পয়সার মালিক; আবার উপযুক্ত বিচারকও বটে। লেখা পড়া জানেন না। তাতেও চলতো, কিন্তু একবার যখন জনসাধারণের ভোটে ইউনিয়নের কর্তা নিযুক্ত হলেন, তখন অন্ততঃ নামটা লেখা না শিখলে চলেনি। তবে অনেক সময় ব্যয় করে আর অনেক কসরৎ করে নিজের নামটুকু লিখতে শিখেছেন। তবে তিনি কাগজে দস্তখত করে দিলে তা' কেবল তিনিই পড়তে পারতেন। তা' ছাড়া আর কেউ তেমন ডিগ্রীওয়ালা লোক এ তল্লাটে ছিল না যে, নামের বানানটা কি লিখেছেন—তা' একবার পড়ে বুঝতে পারে। তিনি বলতেন—ওরে, অতো কষ্ট করে আমার লেখা পড়তে হবে না। নিয়ে যা-না দরখাস্তখানা—দেখি, কোন্ লাটসাহেব 'এলাউ' না করে পারে! সত্যি তাঁর দস্তখত করা কোন রিপোর্ট এবং কোন দরখাস্ত উপরে যেয়ে কাগজের গাদার মধ্যে পড়ে থাকেনি। উপরওয়ালারা সবায় চিনতেন সরদার সাহেবকে। তাঁর কাজ না হলে সরদার

সাহেবের দাপটে উপরওয়ালারা অস্থির হয়ে উঠতেন। এমন ডাক সাইটে মাতব্বর যখন মাইকের সামনে দাঁড়ালেন, তখন সবায় চুপ করে বসলো। তিনি বললেন—

ভাইসব!

আপনারা জানেন—আজ আমরা কেন এখানে এসেছি! আমরা ইচ্ছা করে আসিনি, আমাদের ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু কেন ডেকে নিয়ে আনা হয়েছে, তাই আমরা শুনতে চাই; তা' ছাড়া আজেবাজে কোন কথা আমরা শুনতে চাইনে! সরকার মহাশয় মনে করেছিলেন এ-সব গেঁয়ো চাষীর দলদের কথার মারপ্যাচে বোকা বানিয়ে ইচ্ছামত তার কাজ হাসিল করতে পারবেন। যাদের মনে হিংসা বাসা বেঁধে আছে, তারা কোনদিন কোন কাজে জয় লাভ করতে পারে না। কবিরাজ মশায়ের উন্নতি হতে দেখে সরকার মশায়ের মনে হিংসা জন্মেছিল, তাই তিনি এইসব শহুরে শিক্ষিত বন্ধুদের নিয়ে এসে তাঁদের হাতে আমাদের ভেড়া বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, আমি সময় মত এসে গেছি এবং আমার এলাকার লোক এতই বোকা নয় যে, তারা পথ ভুল করবে। যে কোন কাজ করবার আগে চিন্তা করে করতে হয়, না করলে পরিণাম অশুভ হয়। তাই শহুরে ভাইয়েরা না বুঝে আমাদের বোকা বানাতে এসে নিজেরাই বোকা বনে ফিরে যাচ্ছে। আমি জানি, দেশ আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাইরের দুনিয়া আজ আমাদের কাছে মনে হয়—বড় আজব! কেননা, তারা শিক্ষা দীক্ষায় এমনভাবে এগিয়ে গেছে যে, আমরা তাদের কার্য-কলাপ দেখে বলবো যে, এরা আমাদের গয়ের আলাউদ্দিনের প্রাপ্ত যাদুর আংটি চেরাগের মত। আংটি চেরাগ হাতে পেয়েছে, তাই সেই শক্তিবলে আজ সেই সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসে আমাদের দেশ শাসন করছে। তারা অতো দূর থেকে যখন এসে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, তখন বুঝতে হবে আমাদের দেশে কোন জ্ঞানী শক্তিশালী লোক তখন ছিল না এবং এখনও নেই। এই শহুরে ভাইয়েরা তাদের পোষাক পরে সাহেব বনে আমাদের উপরে মাতব্বরি চাল চালতে এসেছেন, কিন্তু যারা সেই কোন দূর দেশ থেকে এসে এদেশের ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে তাদের ঘর ভরে ফেলছে, তাদের কার্য-কলাপের উপর

প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। সে-রকম জ্ঞানও তাঁরা লাভ করেনি, সেই রকম শক্তিও তাঁদের মনে নেই। এনারা নিজেদের জাত মান সব পড়ের পায়ে বিলিয়ে মানুষ নামের এই সব কীটগুলোর উপর তীর ছুড়তে এসেছেন। আমি তাঁদের বলতে চাই—দেশ আজ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে অনেক নতুন নতুন জিনিষ-পত্র আবিষ্কার হচ্ছে, কিন্তু সে-সব ব্যবহার করবে কারা! দেশের লোক যদি এমনই ভাবে মূর্খ থেকে যায়, তা' হলে তারা কি করে বুঝবে আপনাদের এইসব নতুন আবিষ্কৃত জিনিষ-পত্রের মূল্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা গাছ-গাছড়ার বড়ি আর হালুয়া খেয়ে দীর্ঘায়ু শেষে সুস্থ শরীর নিয়ে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আর আপনাদের এ-সব নতুন ঔষধ খেয়ে ক'জন রোগী সুস্থ হতে পেরেছে বা যারা হয়েছে, তাদের উন্নতিই বা কি এমন হয়েছে—তা' দেখবার মত ক্ষমতা আপনাদের নেই। কেননা, আমাদের দেশের প্রায় সব'য় চাষা। আমরা মাঠে মাঠে থাকি, হাল চাষ করি - গরু ছাগল চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমরা চিনি আমাদের দেশের মাটিকে আর তার বুকে জন্মান গাছ-গাছড়াকে। তাই সেই সব গাছ-গাছড়ার প্রতি আমাদের আন্তরিক দরদ রয়েছে। আমরা এর ব্যবহার বিধি বুঝি, তাই এ-সব হালুয়া বড়ি খেলেই আমাদের রোগ ভাল হয়ে যায়। আপনাদের নতুন আবিষ্কৃত ঔষুধ ভাল আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সেই সব ঔষধের সাথে আমাদের পরিচয় করাচ্ছে কে! যে শিক্ষা লাভ করে মানুষ এ-সব নতুন জিনিষ-পত্র বানিয়েছে সেই শিক্ষার বীজ দেশের ঘরে বাইরে না ছড়ালে ফল ধরবে কোথা থেকে! অতএব, দেশের প্রতি যদি আপনাদের একান্তই দরদ থাকে, তা'হলে গ্রামে দু'একটি করে নতুন শিক্ষার স্কুল গড়েন। সেখানে আমাদের ছেলে-মেয়েরা পড়ুক, জ্ঞানী হোক, তখন বুঝবেন আপনারা আমাদের দুয়ারে যে নতুন সওগাত নিয়ে এসেছেন, সেটা হেয় করবার নয় -দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে চেপে ধরবার মত।

সরকার মহাশয় অনেক আগেই কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে নিয়ে এসেছেন। তারা এতক্ষণ এই অশিক্ষিত মূর্খ ইউনিয়ন কর্তার বক্তৃতা মন দিয়ে শুন্‌ছিলেন। সরদার সাহেব যে এমনভাবে বক্তৃতা দিতে পারবেন, তা' উপস্থিত কেউ জানতেন না। কবিরাজ মহাশয় হাতে তালি দিলেন। তাঁর দেখাদেখি জনতাও

হাতে তালি দিলো। শহরে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন!

সরদার সাহেব মাইক ছেড়ে যেয়ে বসলেন। কবিরাজ মহাশয় আস্তে আস্তে উঠে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। জনতা নিশ্চুপ! 'টু' শব্দটি নেই কোথায়ও। কবিরাজ মহাশয় বললেন—ভাইসব! সরদার সাহেব যা' বলেছেন—আমি সব শুনেছি। তাঁর প্রত্যেকটি কথা মূল্যবান। আমি যা' বলতাম, সে-সব কথা তিনিই বলেছেন। তবে আমি বলতে চাই—আমার ভাই সরকার মহাশয় শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষ, জেনে শুনে কেন ভুল করতে গেলেন, তা' বুঝলাম না। প্রথম হচ্ছে আশে পাশে যে সমস্ত সম্মানী লোক আছেন, তাঁদের না নিয়ে তাঁর এই সভার আয়োজন করা; দ্বিতীয়তঃ তাঁর শহরে বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এসে আমাদের কাছে অপমান করাচ্ছেন। যাক, সে কথা—কেননা, মানুষ মাত্রেই ভুল করে। তিনি যে কেন আজকে এখানে সভার আয়োজন করেছেন, তা' জানিনে, তবে এইটুকু বুঝি—তাঁর ব্যবসায় কোন উন্নতি হচ্ছে না—সেই কারণে। আমি পুরানো দিনের ভাবধারার কবিরাজ, আর উনি আধুনিক যুগের নতুন শিক্ষার আলোক পাওয়া ডাক্তার। আমার উপর উনার মনে হিংসা জন্মেছিল। জন্মানোও স্বাভাবিক। কেননা, উনি মনে করেন—আমি হচ্ছি নতুন জগতের বিস্ময়কর আবিষ্কৃত ঔষধ-পত্র নিয়ে নতুন ভাবধারার ডাক্তার। আর উনি হচ্ছেন সেই পুরানো দিনের রীতি-নীতিতে গড়া গাছ-গাছড়ার কবিরাজ। আমি দামী দামী বোতলে লেবেল আঁটা মূল্যবান ঔষধ-পত্র নিয়ে বসে বসে দিন কাটাই, আর উনি যত রাজ্যির গাছের শিকড়-পাতা বেঁটে বড়ি আর হালুয়া বানিয়ে দিন রাত রোগীর ভিড় কমাতে পারেন না। এ সব মূর্খেরা আমার কথা বোঝে না, তাই আজ ওসব কবিরাজের গাছড়া ঔষধ খায়। তাই তিনি এদের বোঝাবার জন্যে তাঁর শহুরে বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এর ফল যে অন্য রকম রঙে ফলবে, তা' তিনি বুঝতে পারেননি। আমি বলতে চাইনে যে, আমার গাছড়া-ঔষুধ ভাল, আর সরকার মহাশয়ের লেবেল আঁটা এ্যালোপ্যাথিক ঔষুধ ভাল না। মানুষ যখন নতুন নতুন জ্ঞান শিক্ষা করে এ-সব আবিষ্কার করেছে, তখন নিশ্চয় এই সব গাছড়া ঔষধের চেয়ে ওর মূল্য অনেক বেশী এবং বেশীর পক্ষে কাজও দেবে ভাল। কিন্তু কথা হচ্ছে

যে, অতি প্রাচীনকাল থেকে দেশের মানুষ মাটি আর তার বুকে জন্মান গাছ গাছড়ার সাথে পরিচিত। কেন পরিচিত, দেশের দু'একজন বাদ দিয়ে আর সব লোকই চাষা। মাঠে কাজ করে, গরু-ছাগল চরায়—তাই, মাঠের আর বনের গাছ-পালা তারা চিনে। আর তার শক্তিও প্রত্যক্ষ দেখে। আর অতি প্রাচীনকাল থেকে এ-দেশে এই একটি মাত্র পথেই চিকিৎসা চলে আসছে। তাই এ-দেশের লোকের এ-সব গাছড়ার প্রতি বেশী টান। আজ দুনিয়াই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক কল-কব্জা আবিষ্কার হয়েছে। এই সব গাছ-গাছড়া সেই সব কলে ফেলে পিষে উন্নত ধরণের ঔষধ তৈরী করছে। যে দেশে এ-সব ঔষধ আবিষ্কার হয়েছে, সে দেশের লোক আমাদের দেশের লোকের মত অশিক্ষিত—শক্তিহীন নয়। তাই সেই দেশের এর আদর আছে। তারা নতুন জিনিষ-পত্র, কল-কব্জা আবিষ্কার করে নব বলে বলীয়ান হয়ে কোন্ দূর দেশ থেকে এসে আজ আমাদের উপর হুকুম জারি করছে। আমাদের যাঁতা কলের মত পিষে ধন সম্পদ লূটে নিয়ে যেয়ে তাদের দেশকে আরও উন্নত করে তুলছে। আমরা অসহায় মূর্খের দল তাদের শোষণে আরও পঙ্গু হয়ে পড়ছি। আমি এ-দেশের মানুষ, এই মাটিতেই আমার পূর্ব পুরুষেরা জন্মেছে; তাই এই মাটির উপর আমার একটা জন্মগত অধিকার রয়েছে। অতএব, আমি যদি গাছ-গাছড়ার বড়ি আর হালুয়া বানিয়ে আমার বাপ-দাদার চৌদ্দ পুরুষের এই কবিরাজি ব্যবসায় দু'পয়সা উপার্জন করি, তা'হলে আমাকে দোষী করা যাবে না। এ-অঞ্চলের লোককে ফাঁকি দিয়ে তাদেরকে ভুল চিকিৎসা করে দু' পয়সা রোজগার করে তাদের অধঃপতনে নিয়ে যাচ্ছি, তা' কেবল সরকার মহাশয়ই মনে করতে পারেন, তাই দেশের লোককে কথার মার প্যাচে হাত করে আমার বংশের জাতীয় ব্যাবসায় লাল-বাতি জ্বালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকার মহাশয়ের এটা ভুল ধারণা। কেননা, আমি জোর করে কাকেও চিকিৎসা করিনি এবং কেউ আমার বাড়ী না এলে আমি তার বাড়ী কোন দিন যাইনি। আর আমি যে বাজে জিনিষ খাইয়ে পয়সা ফাঁক দিয়ে নিয়েছি, এমন প্রমান কেউ দিতে পারবে না। তবে সরকার মহাশয়কে যে এখান থেকে ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়ে যেতে বলি; তা' নয়; আর তাঁর কাছে রোগীকে যেতে নিষেধ করি, তা-ও নয়। কথা

হচ্ছে এ্যালোপ্যাথি আমাদের দেশে নতুন আমদানী ঔষধ। ওর বহুল প্রচার আমি কামনা করি; তবে সময় লাগবে। কেননা, দেশে শিক্ষিত বলতে যা' দু'একজন আছেন, তারা শহরে বাস করেন। পাড়া-গাঁয়ে সবায় অশিক্ষিত। অন্ততঃ কিছু সংখ্যক গেঁয়ো লোককে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তা'হলে তাদের দিয়েই এ-সব হাজার হাজার মানুষকে ঠিক পথে চালনা করা যাবে। সরকার মহাশয় এখানকার বাসিন্দা নয়। তিনি নতুন এসেছেন এবং তিনি যা' হাতে করে এনেছেন, তাও নতুন। পুরানো হয়তো শহরে লোকের কাছে, কিন্তু গাঁয়ে এ-সব নতুন। তাই তাকেই কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, তবে তাঁর ঔষধ বিশ্বাস করবে কি করে! তাকে বিশ্বাসী হতে গেলে তার এ-সব শহুরে বন্ধুদের নিয়ে তার দেশের সম্মানী, পয়সাওয়ালা লোকদের নিয়ে পুরানো টোল বাদ দিয়ে যায়গায় যায়গায় আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করুন। দেশের ছেলে-মেয়েরা তা'তে পড়ে শিক্ষা লাভ করুক, জ্ঞান লাভ করুক—দেশ ও দশের সাথে পরিচিত হোক; তখন ঘরে ঘরে সরকার মহাশয়ের নাম কীর্তন হবে। সরকার মহাশয়ের পথ সত্যি, কিন্তু তার রীতি-নীতি সত্যি নয়। তাঁর প্রতি আমার নিবেদন—তিনি গ্রামে গ্রামে পুরানো টোলের পরিবর্তে আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষালয় তৈরীর জন্য আমাদের আহ্বান করুন, আমরা তার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করি। দেশের লোক আলোর সন্ধান পেয়ে জেগে উঠুক। এমনভাবে গোড়া থেকে আন্দোলন না করলে যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশের ধন-সম্পদ দিয়ে অন্য দেশ গড়ে উঠবে আর দেশের লোক আরও পঙ্গু হয়ে পড়বে। ফলে সরকার মহাশয়ের মত লোকদের ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে।

কবিরাজ মহাশয় বসলেন। চারদিক থেকে তুমুল হর্ষধ্বনি আর হাত-তালি পড়তে লাগলো। এবার সরকার মহাশয় মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন—ভাইসব! কবিরাজ মহাশয় যা' বলেছেন, এটা ঠিক। দেশের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পোঁছে দিতে না পারলে পরাধীনতার শৃঙ্খল আমাদের হাত-পা থেকে খসে পড়বে না। আমি কবিরাজ মহাশয়কে সমর্থন করি এবং তাঁর কথামত কাজ করতে চেষ্টা করবো। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন।

সভা ভেঙ্গে গেল। উপস্থিত জন-সাধারণ কবিরাজ মহাশয়ের গুণ কীর্তন করতে করতে বাড়ী গেল। কবিরাজ মহাশয়েরও বর্তমানে নিজের ব্যবসায়ের আশাতীত উন্নতি হবে আর ভবিষ্যতের এক রঙিন স্বপ্নালু দিনের কথা মনে করে খুশীতে অন্তর ভরে উঠলো। প্রথমতঃ আজকের এই জনসভায় তার প্রতি উপস্থিত সকলের বেশী করে ভক্তি এসে গেল। দ্বিতীয়তঃ দেশের লোককে নতুন শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে যে সাড়া দিয়েছেন, তা' যদি কার্যকরী হয়, তা'হলে তার ভবিষ্যতও উজ্জ্বল। কেন না, তার ছোট ছেলে ডাক্তারী পড়ছে।

॥ ১৪ ॥

কবিরাজ মহাশয় ভাত খেয়ে একটা পান বিবোতে চিবোতে খাটের উপর শুয়ে পড়লেন, তখন আসমত পাঁচিলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিল—কবিরাজ মশায় বাড়ী আছেন নাকি ?

কবিরাজ মহাশয় শুয়েছেন, এখনও ঘুমোননি, ডাক শুনে হুড়্‌মুড়্‌ করে উঠে বসলেন। বাতি জ্বেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পাঁচিলের দরজা খুলে আসমতকে দেখে কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। আসমতকে তিনি চেনেন না। একজন অপরিচিত লোক রাত দুপুরে তার বাড়ী এসে ডাকাডাকি করছে, কিন্তু কেন ? তিনি একটু আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন—তোমাকে তো চিনতে পারলাম না ?

আসমত একটু হেসে বললো--আমাকে চিনতে পারবেন না। আমার বাড়ী এখানে নয়। এখানে আমার শ্বশুর বাড়ী।

—তা' এত রাতে কি মনে করে ?

—এতো রাতে কোথায়! এসেছি যে সেই সন্ধ্যেবেলা।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

—কেন, বৈঠকখানায়!

—অন্ধকারে!

—হ্যাঁ।

—আলো নিয়ে আসোনি ?

—বেলা যখন ডুবো ডুবো তখন বাড়ী থেকে এসেছি, তখন আলো আনবো কি দুঃখে ?

—দুঃখটা যে কি বুঝতে পেরেছো! আলো না আনার দরুণ তোমার এই কষ্টভোগ। আমি বাড়ী এসেছি অনেক আগে, বৈঠকখানায় আলো না দেখে সোজা বাড়ীর মধ্যে চলে যাই। তা' যাক, আসবার কারণটা কি ?

—আমার শ্বশুরের হঠাৎ জর।

—জর!

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য লোক যে তুমি বাবা! জরের জন্য ডাকতে এসে রাত দুপুর পর্যন্ত বসে আছো!

—হঠাৎ গা কেঁপে জর এসেছে, চারখানা কাঁথা আর দু'খানা লেপ চাপিয়েও কাঁপুনি কমেনি, তাই তখনই আমার শাশুড়ী আপনাকে ডাকতে পাঠালেন।

—তোমার শ্বশুরের নাম?

—আমজেদ আলী মণ্ডল।

—এখন যেতে হবে নাকি?

—জ্বি-হ্যাঁ।

—আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও বাবা, আমি ঔষধের ব্যাগটা নিয়ে আসি।

আসমত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই ছাড়তে লাগলো। মিনিট-দশেক পর কবিরাজ মহাশয় ব্যাগ আর তার চিরসঙ্গী বেতের লাঠিখানা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। আসমত তার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে আগে আগে চললো আর কবিরাজ মহাশয় বাঁ-হাতে লণ্ঠন আর ডান হাতে লাঠি নিয়ে তার পিছে পিছে চললো।

ওদিকে বুড়ো লেপের তলায় কোঁকাচ্ছে আর মাঝে মাঝে বলছে—ও আল্লাহ, গেলাম গো—মলাম গো। বুড়ি আর তার নাতি লেপের উপর চেপে পড়ে আছে। জামাই যে সেই সন্ধ্যেবেলা কবিরাজ মশায়কে ডাকতে গেছে, আর এখন রাত দুপুর হয়ে গেছে—তাও ফিরে আসছে না, তার জন্য আর এক চিন্তা। না-জানি তার আবার কি হলো! বুড়ো মাঝে মাঝে খেঁকিয়ে উঠছে—তাকে আবার পাঠালে কেন? আমি বুড়ো মানুষ, না হয় মরে যাই, কিন্তু আমার জন্য জামাই মরলে কি হবে রে। ওরে গেলাম গো—মলাম গো। বুড়ি ধমক দিয়ে বলছে—তুমি চুপ কর দেকি, জামাই মরবে কেন! হয়তো কবিরাজ মশায় বাড়ী নেই, তাই আসতে দেরী হচ্ছে।

বললো, তখন মনে করলাম বোধ হয় তোর সময় হয়েছে ; তাই তক্ষুনি ছুটে এলাম।

—আমার কথা না বললে যে তুমি তাড়াতাড়ি আসবে না—তা জেনেই ফাঁকি দিয়েছি।

— তাড়াতাড়ি কি ! তোর কথা না শুনলে মোটেও আসতাম না।

—ও-সব কথা এখন বাদ দাও খালা'। যা' করতে হয় কর। আমি নতুন, কিছু বুঝিনে।

সেই দিন থেকে পরিছনের সাথে সখিনার কথাবার্তা চলতে লাগলো ! কাজে অকাজে পরিছন তার ছোট জা'-কে নিয়েই করে, সখিনাও।

পুরানো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে সখিনার খাওয়া হয়ে গেল। রান্নাঘরের জিনিষ-পত্রগুলো গুছিয়ে রেখে ঘরে গেল। অবশ্য বাসন-গ্লাস বাটিগুলো ঘরে নিয়ে গেল। বলা তো যায় না, চোর কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে ; সুযোগ পেলে নিয়ে যাবে। পরদিন সকালে তার ভাইয়েরা চলে গেল। যাবার বেলা তার ভাই জিজ্ঞেস করলো—আজকাল সে বাপের বাড়ী যাবে কি-না। সখিনা বললো—এখন আর যাব কি করতে, সময় মত এসে নিয়ে যেও—অনেক দিন থেকে আসবো। বাড়ী যেয়ে মাকে আমার খবরটা একটু দিও। বলো—মাস চারেক যাচ্ছে। ওরা চলে গেলে নিয়ামত পুকুর থেকে স্নান সেরে এসে পান্তাভাত খেয়ে নিল। বেলা হয়ে যাচ্ছে—আজ আবার মিয়া সাহেবের জনে যেতে হবে তো।

॥ ১৫ ॥

নিয়ামত তার দামড়া গরু দু'টো দলের জমিতে বেঁধে মিয়া সাহেবের জমিতে যেয়ে দেখে—নছর মণ্ডল আর লবা এসে বসে আছে। নিয়ামতকে দেখে বললো—ওরে ও নিয়ামত! তোমার আগে তো কেউ কোন দিন মাঠে বেরুতে পারে না, আজ কিন্তু আমরা আগে এসেছি। নিয়ামত হাসতে হাসতে বললো—আজকেও কি আসতে পারতে! ভাইয়েরা বাড়ী গেল কি-না, তাই কথাবার্তা বলতে বলতে একটু দেরী হয়ে গেল। নছর মণ্ডল বললো—সে কি আমি জানিনে! তা' যাক, হুকোটা সাজো দেখি—দু' একটান দিই!

নিয়ামত কলকেয় আগুন দিয়ে বার কয়েক টেনে একটা লম্বা দম দিয়ে হুকোর মুখটা চোয়ালে মুছে নছর মণ্ডলের দিকে এগিয়ে দিল। এর মধ্যে আর সবায় এসে গেল। নিয়ামত সকলের ডানে পাই ধরলো।

নছর মণ্ডল বললো—হ্যাঁ, কাল বুড়ো মিয়া সাহেবের সম্বন্ধে যা বলছিলাম -

সকলে বললো ও হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই বল।

নছর মণ্ডল বললো—মেছের চোর চালান দিলে গ্রামে তদন্তে এলেন দারোগা। তিনি এ-দেশের লোক না, ঐ যে ইংরেজ না কি বলে—তাই। মিয়া সাহেব এগিয়ে গেলেন। দারোগা সাহেব—'হ্যাল্লো, মিয়া সাহেব' বলে এগিয়ে এসে হাতে হাত মিলালেন। মিয়া সাহেব কিভাবে চোর ধরেছেন, সব খুলে বললেন। সব কথা শুনে দারোগা সাহেব মিয়া সাহেবকে কিছু পুরস্কার দিতে গেলেন। মিয়া সাহেব বললেন—আরে, ওকি করছেন আপনি! যারা কষ্ট করে রাত জেগে ধরেছে তাদের দিন না!

সাহেব বললেন—তা' কি করে হয়! কষ্ট তো অনেকে করতে পারে, কিন্তু প্ল্যান তৈরী করতে পারে কয়জনে! আপনি যে প্ল্যান করেছেন, এরা সেই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করেছে। অতএব আপনাকে আগেই সম্মান দেখানো আমার কর্তব্য। মিয়া সাহেব বললেন—আপনি যারা কষ্ট করেছে, তাদের পারিশ্রমিক দিন। আপনার কাছ থেকে উৎসাহ পেলে ওরা আরও ভাল

কাজ করতে পারবে। আমার আরও অনেক প্ল্যান আছে ; সবটায় জয়লাভ করে নিই, তখন আমাকে সম্মান দেখাবেন। মিয়া সাহেব আমাকে ইশারা করলেন, আমি এগিয়ে যেয়ে সালাম দিয়ে দাঁড়ালাম।

জবা জিজ্ঞেস করলো – তুমি সেই দলের মাতব্বর ছিলে নাকি ?

—হ্যাঁ, বাবা। মিয়া সাহেব আমাকে খুব ভাল বাসতেন! তিনি যখন যা' বলতেন, আমি তাই করতাম, আর তাঁর সাথে সাথে ঘুরতাম কি-না!

—তারপর চাচা, তারপর ?

—আমি সামনে যেয়ে দাঁড়াতেই মিয়া সাহেব বললেন—এই হচ্ছে 'পার্টির লিডার'। সাহেব তাঁর ডান হাত এগিয়ে দিলেন আমার দিকে 'গুড্ মর্নিং, মাই ইয়ং ব্রাদার!' আমিও তার হাতে হাত দিয়ে 'হ্যাণ্ডসেক' করলাম। ওরে বাবা! কি নরমরে সে হাত! আমার আজও মনে আছে।

নিয়ামত বললো—চাচা বোধ হয় কিছু লেখাপড়া জানে।

—তা' বাবা একটু শিখেছিলাম। ছোটবেলা কোন কাজ করতাম না, কেবল টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াতাম। মাঝে মাঝে স্কুলে যেতাম। কত বই যে আমি ছিঁড়েছি রে বাবা! সে কথা মনে হলে, আজ নিজের উপর খুব রাগ হয়। আমি ছিলাম এক বাপের একমাত্র ছেলে, তাই বাপজান কিছু বলতেন না। অনেক বই-ছেলেট নষ্ট করে ও-পাড়ার ওমর মাষ্টারের সাথে ঘুরে ঘুরে কিছু শিখেছিলাম। যদি আর একটু বেশী করে শিখতাম, তা' হলে আজ কি তোমাদের সাথে মাঠে মাঠে ঘুরতাম ! এতোদিন কিছু না হলেও কোন অফিসের একটা কেরাণীও হতে পারতাম। কি বলবো ভাগ্য খারাপ, নইলে চাষ কাজ করবো কেন! তারপর বাপজান মরে গেছেন, আমি তখন ছোট। মা আমাকে আর কোথাও যেতে দিতেন না। নইলে যা শিখেছিলাম, তাতেই একটা চাকরী পেয়ে যেতাম। সেরকম ভাগ্য আমার যখন নেই, তখন সে কথা যাক্। তারপর সাহেব আমার হাতে পঁচিশ টাকা দিলেন। বললেন—তোমার পার্টির সবায়কে কুড়ি টাকা দিবে আর তুমি নিবে পাঁচ টাকা। আমি টাকা হাতে পেয়ে যেন চমকে উঠলাম। তখনকার দিনে পঁচিশ টাকা! সে কি সোজা টাকা! কয়জন লোকে একত্রে

অত টাকা দেখেছে! এখন একবেলা জন দিলে এক টাকা পাওয়া যায়, আর তখন সারাদিন খেটেও দু' আনা, দশ পয়সা পাওয়া যেত না।

মিয়া সাহেবের ইঙ্গিতে আমার পার্টির সব লোককে এক জায়গায় করলাম। সবার হাতে একটা করে মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়ালো। সাহেব দেখে খুব খুশী হলেন। বললেন বাহঃ! বেশ জোয়ান সিপাই বানিয়েছে মিয়া সাহেব! তিনি সবার হাতে হাত মিলালেন, আর বললেন —তোমরা ভাল কাজ করছো। আরও ভাল কাজ করো, আমি পুরস্কার দেব।

বেলা বললো—ও চাচা! সাহেব কি বাংলা বলতে পারতেন?

—আমি যেরকম বলছি এমন করে বলতে পারতেন না। কিছু বাংলা কিছু ইংরেজী মিশিয়ে বলতেন। আমার কি ছাই সে-সব কথা মনে আছে! আমি টাকাগুলো সবার মধ্যে ভাগ করে দিলাম। আমরা দলে ছিলাম আট জন। সকলে তিন টাকা করে আর আমি চার টাকা নিলাম। সবার মনে উৎসাহ জন্মে গেল। সেদিন থেকে আমাদের দলের সংখ্যা বেড়ে গেল। এক সপ্তার মধ্যে হলো কুড়িজন। মিয়া সাহেব সবায়কে একদিন ডাকলেন। আমরা সকলে এসে তার বৈঠকখানায় হাজির হলাম। তিনি বললেন— তোদের দিয়ে আমি আর একটি কাজ করাতে চাই।

আমি বললাম—আমরা যে কাজ করতে পারবো, তেমন কাজ একটা কেন—বিশটা করিয়ে নিন, আমরা পিছ-পাও হব না।

তিনি বললেন—আমাদের অনেক কিছুর অভাব। তবে একসাথে তো সব কাজ আরম্ভ করা যায় না। প্রথমে একটা কাজ করতে হবে, সেই কাজে জয়লাভ করতে পারলে সব কাজ সহজ হয়ে যাবে। প্রথমে আমাদের সমবায় সমিতি তৈরী করতে হবে।

নিয়ামত জিজ্ঞেস করলো—সে আবার কি?

—অতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন বাবা! বলছি, সব বলবো। তখন আমরা ছিলাম পরাধীন। তবু মিয়া সাহেবের কথামত চ.ল. বেশ সুখেই ছিলাম। আজ যদি বুড়ো মিয়া সাহেব বেঁচে থাকতেন, তা'হলে দেখতে বাবা—গ্রামের চেহারা কেমন বদলে যেত। তিনি বল.তেন—চিরদিন কি আমাদের পরের

গোলামী করতে হবে রে! গোলামীর বন্ধন ছিন্ন করতে হবে আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন তো চারিদিকে চলছে, একদিন নিশ্চয় হবে। তবে সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি, তা'হলে দেখিস—কেমন করে দেশের খেদমত করতে হয়। এখন দেশকে গড়ে তুলতে গেলে অনেক বাঁধা। এক জায়গায় যদি গড়েছো, তা' হলে ওরা ভেঙ্গে নিয়ে তাদের দেশে নিয়ে যাবে। অতএব এখন থেকে নিজেদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। গড়বার দিন একদিন আছে! যদি সেদিন তোদের মধ্যে আমি বেঁচে না থাকি, তোরা যেন আমার কথা অবহেলা করিসনে। আর আমার গড়া প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে ফেলিসনে। নিজের দেশের মানুষের প্রতি, মাটির প্রতি যাদের প্রাণের টান না থাকবে, তারা পশুরও অধম। স্বাধীন আমরা একদিন হবই। সেদিন আমাদের নব স্বাধীন দেশকে কি করে অভ্যর্থনা করতে হবে, কি সওগাত দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে হবে, সেই ব্যবস্থার জন্য আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হ'তে হবে। নতুন নতুন কর্মঠ জোয়ানদের দরকার হবে! সেদিন আমাদের পরিবর্তনের দিন। নীচে সিপাই থেকে উপরের অফিসার, রাষ্ট্রনায়ক সব নতুনের দরকার। তবে সে কি রকম নতুন হবে—যাদের দ্বারা দেশ গড়ে উঠবে, দেশ শিক্ষিত ও সমৃদ্ধশালীতে পরিণত হবে; দেশে দূর্নীতি, কালো-বাজারী, অত্যাচারী, জুলুমবাজী চলবে না। সমস্ত অসৎ পথ থেকে শুদ্ধ হয়ে আমাদের নতুন দেশের খেদমত করতে হবে। স্বাধীন আমরা একদিন হবই; অতএব, সেদিনের জন্য আমাদের আজ থেকে প্রস্তুত হতে হবে। নিজেদের আত্মাকে শুদ্ধ করতে হবে। একজন ভাল হও, তার সংস্পর্শে আর একজন ভাল হোক। এমনি করে একটার পর একটা ভাল হতে হতে যেদিন সবায় ভাল হয়ে যাবে, সেদিন জেনে রেখো—আমরা নিশ্চয় স্বাধীনতা পাব, আমরা সত্য পথের সন্ধান পাব, আমরা প্রকৃতই সুখী হব! আজ আমরা স্বাধীন হতে চলেছি, কিন্তু মিয়া সাহেবের কল্পিত আত্মাকে শুদ্ধ করে দেশকে অভ্যর্থনা করতে পারছিনে; তাই আজ আমাদের এমন অধঃপতন।

মিয়া সাহেবের কথামত 'সমবায় সমিতির' কাজে লেগে গেলাম। তার কথা হচ্ছে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে অপরকে সাহায্য করবার নাম 'সমবায়।' আমরা প্রথমে একটা সমিতি গঠন করলাম। তার সদস্য সংখ্যা হ'ল চব্বিশ-

জন। সকলে এক টাকা করে চব্বিশ টাকা জমা দিলাম মিয়া সাহেবের কাছে। তারপর মাঝে মাঝে বাইরে যেতাম চাঁদা সংগ্রহ করবার জন্য। দু'মাসে আমাদের টাকার পরিমাণ হ'ল পঁচানব্বই। তখন জমির দাম ছিল কম। সেই টাকা দিয়ে তিন বিঘে জমি কিনলাম। মিয়া সাহেব বললেন—আমরা সব পাড়াগেঁয়ো লোক, চাষী মানুষ। জমি কেনায় ভাল। সমিতির নামে জমি কেনা হ'ল। মাঝে মাঝে আমরা যারা সমিতির সদস্য ছিলাম, সকলে সেই জমি চষতাম। বীজ বোনার সময় এলে মিয়া সাহেব পাটের বীজ দিলেন। আমরা সবায় মিলে একদিন সেই জমিতে পাট বোনলাম। মাঝে মাঝে আমরা পালা করে সেই পাট নিরানো, কাটা, ডুবানো, ধোয়া—সব করলাম। সেই বছর পাট হ'ল সতেরো মণ। সেই বছর পাটের দর ছিল আঠারো টাকা। যে টাকা হ'ল, তার মধ্য থেকে দু'শো টাকায় ছয় বিঘা জমি কেনা হ'ল। আর বাকি টাকা জমা রাখা হ'ল! এ টাকা জমা রাখার কারণ, তখন অনেকের মাঝে মাঝে অভাব হতো; তারা সুদখোরের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে এমনভাবে দেনায় জড়িয়ে পড়তো যে, আর কোন দিন হয়তো উঠতে পারতো না। তাই মিয়া সাহেব বললেন—যারা অভাবে পড়বে, তাদের এই টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হবে। তাকে কোন লাভ দিতে হবে না। হাতে টাকা এলে ফিরিয়ে দেবে। তা'হলে কেউ সুদখোরের হাতে পড়ে নাজেহাল হবে না। সেই হতে আমরা সমিতি থেকে বিনা সুদে ঋণ দিতে লাগলাম। অবশ্য সমিতিতে যারা ছিলাম, তাদের যখন দরকার হতো—তখন পেত, আবার সময় মত জমা দিত। ফলে তাদের কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। সমিতির সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে গেছে, কাজও এগিয়ে গেছে। একদিন মিয়া সাহেব বললেন—একেবারে নিরানন্দের মধ্যে থাকলে উন্নতির আশা করা সম্ভব নয়। তিনি জোয়ানদের আমোদ-আহ্লাদ করবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি নিজের একখানা জমি সমিতিকে দিয়ে দিলেন। আর সমিতির টাকা দিয়ে একটা ফুটবল কিনে দিলেন। নতুন বল নিয়ে যেদিন আমরা মাঠে নামলাম, সেদিন আমাদের যে কি আনন্দ! তখন এ-অঞ্চলে কোথাও বল খেলা হত না। আমাদের খেলা দেখতে বাইর-গ্রাম থেকে লোক আসতো। আমরা তাদেরও খেলতে দিতাম।

বাইরের গ্রামের অনেক লোক আমাদের সমিতি ভুক্ত হল। আমাদের সমি
কাছ থেকে টাকা নিয়ে বহু লোকের উপকার হত। আবার কোন গ
লোক বা তাদের ছেলেমেয়ে মারা গেলে এই সমিতির টাকা দিয়ে কাফ
দাফনের ব্যবস্থা করা হত। জমি বাদে যখন আমাদের টাকা হাজারে
দাঁড়ালো, তখন একদিন মিয়া সাহেব বললেন—আমাদের গ্রামের ছে
মেয়েদের পড়াবার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে
একটা স্কুল তৈরী করা। আমরা সমিতির টাকা দিয়ে জমি কিনলাম। তারপ
একদিন সমিতির সব লোক দা-কুড়ুল নিয়ে বাঁশ খুটি কেটে এক দিনেই ঘরে
কাঠাম দিয়ে ফেললাম। এক সপ্তাহের মধ্যে ঘর প্রস্তুত হয়ে গেল।

মিয়া সাহেব বললেন—কাল থেকে তোদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে
দিস। পরদিন গ্রামের ছেলে মেয়েরা হৈ-হুল্লোড় করতে করতে স্কুলে এলো।

সবা, বেলা, নিয়ামত বললো—আমাদের একটু একটু মনে আছে, তখ
ছোট ছিলাম; আমরাও তো স্কুলে গেলাম।

তোমরাই তো সেই সব ছাত্র। তোমাদের শৈশবের কথা হয়তো ভা
ভাবে মনে নেই, কিন্তু আমার সব মনে আছে। ওমর মাষ্টার এলো, আ
আমি গেলাম। মিয়া সাহেব বললেন—তোমরা দু'জনে পড়াতে থাক, মাসে
মাসে তোমাদের কিছু দেওয়া হবে। তারপর তোমরা যদি না পার, অন্যলোক
রাখলে হবে। সেদিন থেকে মাষ্টারী করতে লাগলাম। মিয়া সাহেব উপরে
গেলেন, সেখানে শিক্ষা 'ডিপার্টমেন্টের' বড় অফিসারের কাছে জানালে
এ-কথা। একদিন ইন্‌সপেক্টর এসে স্কুল ভিজিট করে গেলেন। খুব প্রশংস
করে গেলেন আমাদের। তিনি বললেন—ভবিষ্যতে আপনাদের উন্নতির আশ
রাখি।

এর পর থেকে আমাদের উৎসাহ আরোও বেড়ে গেল। মিয়া সাহে
আমাদের যে মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন, সেই মন্ত্র বলে আমরা অনেক সৎ কা
করতে লাগলাম। যেমন রাস্তা বাঁধা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, পুকুর পরিষ্কা
করা, গ্রামে যারা গরীব মানুষ, তাদের কাজে সাহায্য করা, তাদের বাড়ীতে
কারও জ্বর-জারী হলে ঔষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করা। সেবা শুশ্রূষা কর
—এ-সমস্ত কাজে আমাদের বেশ আনন্দ বোধ হত। তোমাদের হয়তো

ছোট বেলাকার কথা একটু একটু মনে আছে। মিয়া সাহেব একজন হাফেজ সাহেবকে নিজের বাড়ীতে রাখলেন। তাঁর বেতন তিনিই দিতেন। গ্রামবাসীদের কিংবা আমাদের সমিতি থেকে দিতে হত না। তিনি একদিন গ্রামের সমস্ত লোককে ডাকলেন। সকলে তাঁর বৈঠকখানায় এসে হাজির হল। যার যত কাজ-ই থাক না কেন, তিনি ডাকলে সব কাজ ফেলে সবায় ছুটবে তাঁর কাছে। তিনি বললেন —কাল থেকে সন্ধ্যের পর তোমরা সবায় একখানা করে আরবী কায়দা নিয়ে আমাদের স্কুলে যেয়ে হাজির হবে। যাদের বাংলা শিক্ষার ইচ্ছা আছে, তারা 'কাইদা' আর 'প্রথম ভাগ' নিয়ে স্কুলে যাবে। আমি একজন হাফেজ সাহেবকে আমাদের এখানে থাকবার জন্যে নিয়ে এসেছি। তাঁর বেতন কিংবা আলোর তেল খরচ তোমাদের দিতে হবে না, আমি সব দেব ; তোমরা কেবল পড়তে আসবে।

কে তার কথা ফেলতে পারে! পরদিন সবায় তাঁর কথামত স্কুলে হাজির হলো। আমি আরবী জানতাম না। আমিও আরবী পড়তে শিখলাম। নামাজ পড়তে শিখলাম। হাফেজ সাহেব সব লোককে আরবী পড়িয়ে আবার বাংলা পড়াতে পারতেন না বলে তিনি আমাকে সেই কাজে নিযুক্ত করলেন। আমাকে তিনি মাঝে মাঝে দশ টাকা করে দিতেন। গ্রামের মধ্যে যারা একান্তই ভাল লোক, তারা মন দিয়ে পড়া-শোনা করতে লাগলো। যারা মন দিয়ে পড়লো, তারা তাড়াতাড়ি নামাজ শিখলো। কেবল আমাদের শিখিয়ে তিনি ছাড়লেন না ; আমাদের মা বোন, বৌ-দেরও মিয়া সাহেবের স্ত্রী পড়াতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ভাল শিক্ষিতা এবং ধার্মিকা ছিলেন। গ্রামের মেয়েরা যাদের যাওয়া-আসা করা সম্ভব, তাদের রোজ দুপুরের পর মিয়া সাহেবের বাড়ীতে যেয়ে পড়াতে হত।

॥ ১৬ ॥

পরদিন আবার তারা মিয়া সাহেবের পাটের জমি নিড়াতে এলো। নিয়ামত পাই ধরেই বললো—ও নছর চাচা, কাল বাড়ী যেয়ে ময়নার মা-র কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বললো—তারাও মিয়া-গিন্নীর কাছে পড়েছে এবং তাঁর কাছেই আমাদের পাড়ার সব মেয়েরাই নামাজ পড়তে শিখেছে। নছর মণ্ডল বললো—আমি কি মিথ্যে বলেছি নাকি? আমি যা যা বলেছি, সব বুড়োদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখগে, আর তোমরা ছোটবেলায় দেখেছো তো আমাদের পড়তে। ও-পাড়ার মধ্যে নিয়ামতের বাপ ছিল মিয়া সাহেবের প্রধান ভক্ত। তারপর কাল যা হচ্ছিল, আমরা যখন আরবী পড়তে শিখলাম, তখন একদিন মিয়া সাহেব সবাইকে ডেকে বললেন—এবার আমাদের একটা পূণ্যের কাজ করতে হবে। একখানি আল্লাহর ঘর তৈরী করতে হবে। সকলে যখন নামাজ পড়তে শিখছো, তখন একটা মসজিদের বিশেষ প্রয়োজন। জুম্মার দিন গ্রাম থেকে গ্রামে যেয়ে নামাজ পড়া কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। আমরা সবায় এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলাম। তবে মাত্র দু'টো লোক আমাদের এ-মতে সাড়া দেয়নি, অবশ্য এর জন্যে তাদের মিয়া সাহেবের কাছ থেকে শাস্তি নিতে হয়েছিল। উপস্থিত সকলে এক বাক্যে জিজ্ঞেস করলো—কারা সে দু'জন?

ঐ যে সরদাররা! বুড়ো সরদার আমার বয়সী লোক আর ছোটটা তখন বয়সে ছোট হলেও সে-ই বেশী শয়তান! ওদের ঘাড়ে যেন সব সময় কুকুরের মত শয়তান চেপে থাকতো। আমরা গ্রাম শুদ্ধ লোক একদিন ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে হাজির হলাম। মিয়া সাহেব বললেন—মসজিদ তৈরী করতে হলে সকলের সুবিধার জন্যে গ্রামের মাঝখানে তৈরী করাতে হবে। কারও স্বার্থের জন্যে তৈরী হবে না। ঐ যে ও-পাড়ার মৌলভী সাহেব, তিনি তখনও ছোট। ওনার বাপ মসজিদের জন্যে জমি দিলেন। মিয়া সাহেব

বললেন—মসজিদ যখন আল্লাহর ঘর, তখন সকলের উচিৎ এতে অংশ নেওয়া। তিনি সেই জমির যে মুল্য, সেটা ভাগ করে গ্রামের সবার প্রতি যে যেমন লোক, তার সেই রকম ভাবে চাঁদা ধরলেন। মৌলভী সাহেবের বাপকে সেই জমির মূল্য দিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি নিতে চাননি। মিয়া সাহেব বললেন—আজ যদি আপনি নিজেই এই মসজিদের জন্যে জমি দিয়ে যান, তা'হলে আপনার আমলে না হোক—কোনদিন যদি গ্রামে দলাদলি হয়ে থাকে, তা'হলে আপনার বংশের লোকের যে দল গড়ে উঠবে, তারা এই মসজিদের জন্যে গর্ব করবে। ফলে অন্য দলের লোক এ মসজিদ ত্যাগ করে যাবে। আর যদি গ্রামের সবার টাকায় এ ঘর গড়ে উঠে, তা'হলে তাদের দলাদলি থাকবে বাইরে ; এ ঘর নিয়ে কেউ দলাদলি করতে পারবে না।

মিয়া সাহেব নিজে হাতে টাকা তুলে মৌলভী সাহেবের বাপকে দিলেন। তিনি বললেন—যার যত রকম অসুবিধা থাক, অন্ততঃ এক ঝুড়ি করে মাটি ফেলে যেও। এটা হচ্ছে আল্লাহর ঘর। পরকালের সম্বল। এর থেকে যারা দূরে থাকবে, তারা বেহেশত পাবে না। সেই সপ্তাহের মধ্যে মসজিদ ঘর তৈরী হয়ে গেল। মাটির ভিত গেঁথে বেড়া দিয়ে ঘেরা হল, আর খড় দিয়ে চাল ছাওয়া হ'ল। যেদিন শেষ হ'ল, তার পরের দিন শুক্রবার। মিয়া সাহেব বললেন--তোমরা সবার কাল নামাজ পড়তে আসবে। যে বিনা কারণে না আসবে, তাকে শাস্তি নিতে হবে আর তাকে সমাজ থেকে বাদ দেওয়া হবে। পরদিন মহা হুলস্থুল বেঁধে গেল। ছেলে-বুড়ো-যোয়ান কেউ বাদ গেল না। কেবল সরদাররা দু'ভাই যায়নি। নামাজ শেষ করে ফিরে এসে মিয়া সাহেব তাদের ডেকে পাঠালেন। লোক ফিরে এসে বললো, তারা বাড়ী নেই। পরের দিন সকালে আমাদের পাঠালেন ডাকতে। তিনি বললেন—আমি বেঁচে থাকতে তাই ওরা এমন করছে। আজ যদি শাস্তি না দিয়ে যাই, তা'হলে ওদের একটা সাহস বেড়ে যাবে। আমি মরে গেলে তখন বেশ গর্ব করবে! মিয়া সাহেবের চোখে ফাঁকি দিয়েছি যখন, তখন গ্রাম শুদ্ধ সবার চোখে ফাঁকি দিতে পারবো। আর তাদের ধোকায় পড়ে অনেক লোক বিপথে যাবে।

আমরা যেয়ে বড় সরদারকে ডাক দিলাম। তার ছেলে বললো - বাবা বাড়ী নেই। তার চাচার কথা জিজ্ঞেস করলাম, বললো সে-ও বাড়ী নেই।

আমাদের কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। বাইরের দিকে ঘাপ্‌টি মেরে থাকলাম। ঘন্টা দুই পরে দেখি বড় সরদার বদনা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আমরা চার-পাঁচজন যেয়ে তাকে ঘিরে ফেললাম। সে বললো আমি এখন যাব না। আমার সময় হলে আমি যাব। আমি বললাম—এখনই যেতে হবে।

—কেন?

—মিয়া সাহেব ডাকতে পাঠিয়েছে।

—মিয়া সাহেবের যেয়ে বল, একটু পরে যাব।

—এখনই যেতে হবে।

—তার মানে! আমি কি তার খাই, না পরি যে, যেতে বললেই যেতে হবে! আমার সময়-অসময় থাকা দরকার তো!

—বটে! এই শওকত! ধরতো, একেবারে বেঁধে নিয়ে যাব। যেমন কুকুর, তেমন মুগুর না ঝাড়লে সোজা হবে না।

আমরা পাঁচজনে মিলে জোর করে ধরে নিয়ে গেলাম। মিয়া সাহেব আগে থেকেই সংবাদ পেয়েছিলেন। আমরা এসে দেখি—তিনি গম্ভীর মিজাজে বৈঠকখানায় বসে আছেন। সেখানে নিয়ামতের বাপ আর মৌলভী সাহেবের বাপ বসে ছিলেন। মিয়া সাহেব নরম মিজাজে জিজ্ঞেস করলেন—তোরা মুসলমান না হিন্দু?

সরদার নিরুত্তর।

—কথা বলছিসনে কেন?

সরদার ঘাড় নীচু করে রইল।

মিয়া সাহেব এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—শয়তানের বাচ্চা শয়তান! কথা বলছিসনে কেন? মুসলমান না হিন্দু, বল?

তবু কথা নেই।

মিয়া সাহেব আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। বেদম মার আরম্ভ করলেন। কয়েক ঘা খেয়ে সরদার ছটফট করতে লাগলো। মিয়া সাহেবের দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুতে লাগলো—কথা বলছিসনে কেন হারামজাদা শুয়রের বাচ্চা। আমি বেঁচে থাকতে তোরা এমন করতে আরম্ভ করেছিস, আর আমি মরে গেলে কি করবি তার ঠিক নেই; হয়তো

গ্রামে পূজো দিবি। তিনি এমন মার মারলেন, যখন মার বন্ধ করলেন, তখন তার হুশ ছিল না। আমরা কাঁধে করে বাড়ী রেখে এসেছিলাম। যখন তাকে বাড়ী নিয়ে গেলাম, তখন বাড়ীতে মেয়ে-ছেলেরা সব কান্না লাগিয়ে দিল। সেই মার খেয়ে সরদার দু' সপ্তাহ্ পর বিছেন ছেড়ে উঠলো।

মিয়া সাহেব তাদের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে বললেন। তাদের সব কাজে বাদ দেওয়া হল। তারা একঘরে হয়ে থাকলো। কিন্তু শয়তান কোনদিন কি একা একা থাকে! যে কোন প্রকারে হোক, তার সংখ্যা বেশী করবে। তারা যখন চলা-ফেরায়, উঠা বসায় নিজেদের নিঃসঙ্গ মনে করতে লাগলো, তখন কোথা থেকে তাদের এক দূর সম্পর্কের ভাইদের নিয়ে এসে ওদের বাড়ীর পূর্ব পাশে যায়গা দিল। তারপর বছর দুই পরে পশ্চিম পাড়ার একঘর হাত করে নিয়ে তাদের সাথে ভাইঝি বিয়ে দিয়ে বেশ একটা ছোট-খাট দল গড়ে তুললো। দল করলো সত্যি, কিন্তু মিয়া বেঁচে থাকতে পর্যন্ত কোনদিন তাঁর সাথে বা তাঁর দলের কোন লোকের সাথে গণ্ডগোল বাধাইনি, বাঁধাতে সাহস করেনি।

একমাস গত হয়ে গেলে মিয়া সাহেব আবার একদিন আমাদের ডাকলেন। বললেন -মানুষের অবস্থা তো চিরদিন এক রকম থাকে না, যার অবস্থা আজ ভাল আছে, কাল হয়তো খারাপ হয়ে যাবে। আবার যার অবস্থা খারাপ আছে, তার অবস্থা হয়তো পরে ভাল হতে পারে। তাই আমি মনস্থ করেছি গ্রামে একটা ঋণ-দান সমিতি গঠন করতে হবে। এটা একটা আলাদা সমিতি হবে। অভাব গ্রস্থদের এই টাকা দিয়ে বিনাসুদে সাহায্য দিতে হবে। আবার সময় মত তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে জমা রাখতে হবে। আগে আমাদের গ্রাম-রক্ষা বাহিনী থেকে যেটা দেওয়া হত, ওটা আর দেওয়া হবে না। কেননা, ও-সমিতিতেও টাকার প্রয়োজন। যে জগত আরম্ভ হয়েছে, এ-জগতে ভাল কারো করতে গেলে প্রতি পদক্ষেপে বাঁধা। ভাল লোক দুষ্কৃতিকারীদের বাঁধা স্বরূপ হলে তারা যে কোন প্রকারে হউক, ভাল লোককে প্যাচে ফেলতে চেষ্টা করবে। তাই অনেক ভাল লোককে অনর্থক মামলা মকর্দমায় জড়িয়ে পড়তে হবে। যদি কোন দিন ভাল লোক অন্যায়ভাবে আসামী হয়ে যায়, তা'হলে তার মামলা চালাতে হবে আমাদের গ্রাম-রক্ষা বাহিনীর সমিতির টাকা দিয়ে।

বর্তমান জগত যেদিকে চলতে আরম্ভ করেছে, তাতে ভাল কাজ করতে পয়সার দরকার হবে। আমার কথামত তোমরা চলো—দেখো, তোমাদের কোন শত্রু পরাজিত করতে পারবে না। আর তোমাদের মত সুখ-শান্তিতেও কেউ থাকতে পারবে না। দেখ, আজ কয়েক বছর ধরে তোমরা আমার কথামত চলছো, এখন দেখতো আশ-পাশ কয়েকখানা গ্রামের চেয়ে এ-গ্রামের মানুষ বেশী সুখে আছে কি-না। সুখে আমরা ছিলাম সত্যি, কিন্তু মিয়া সাহেব মরে গেলে সব ভেঙ্গেচুরে গেল। শয়তানের দল বড় হয়ে গেল, ভাল লোকের দল কমে গেল। বুড়ো মিয়া সাহেব যেদিন মরে গেল, সেদিন যেন রাজ্যির লোক তাঁর বাড়ীতে এলো। তাঁর জানাজায় যে লোক দেখেছি, এতো লোক আমি আর কারও জানাজায় দেখিনি।

লবা জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা, মিয়া সাহেব মরে গেলে তাঁর গড়ে তোলা সব প্রতিষ্ঠান কি হল!

—কি হবে, সব ভেঙ্গেচুরে গেল। তিনি যখন মরে যান, তখন ছোট মিয়া সাহেব নাবালক। তিনি যখন সাবালক হয়ে উঠলেন, তখন সব ভেঙ্গেচুরে গেছে। গ্রাম-রক্ষা বাহিনীর সরদার ছিলাম আমি। একদিন কোন কাজের জন্যে দলের লোক সব ডাকলাম। সবায় এলো না, অল্প কয়েকজন লোক এলো মাত্র। সেই দিনই আমি বুঝলাম—মিয়া সাহেবের নিজ হাতে গড়া সমিতি আজ হতে ভেঙ্গে গেল। যারা আসেনি, তাদের সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানলাম—তারা আর এ সমিতির মধ্যে থাকতে চায় না। কে নাকি তাদের বলেছে, মিয়া সাহেব সমিতির কর্তা ছিলেন; টাকা পয়সা সবই তার হাতে থাকতো। তিনি কোন রকমে খাতা-কলমে হিসেব মিলিয়ে টাকা পয়সা লুটে নিজের বাক্স ভর্তি করেছেন। তিনি মরে গেছেন, এবার নছর মাষ্টার মিয়া-গিন্নীর সাথে পরামর্শ করে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে নিজের ভুড়ি বানাবে। আমি যখন এ-কথা শুনতে পেলাম, তখন দাঁতে জিভ্ কেটে লোক পাঠালাম তাদের ডাকতে। মিয়া সাহেব যে কোথাকার টাকা এবং কার টাকা মেরে নিজের বাক্স ভরে রেখে গেছেন, সেটা তাদের কাছ থেকে জানতে চাইলাম। পাঁচ ছ' জন বাদে সবায় এলো। আমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম—মিয়া সাহেব যে টাকা মেরেছেন, সে কথাটা তাদের কে বলেছে?

তারা কেউ উত্তর দিল না, কেবল এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। আমি একটু গম্ভীর হয়ে বললাম—কি হল, কথা বলছো না কেন! এ-কথাটা কারও কাছে শুনেছো—না তোমাদের বানানো কথা! যদি শুনে থাকো, তবে কে বলেছে—আর যদি কারও কাছে না শুনে থাকো, তা'হলে কার টাকা মেরেছেন, তাই বল। কেউ কোন কথা বললো না! আমি জানতাম—যে শয়তানটাকে আমরা সমাজচ্যুত করেছিলাম, সেই শয়তানই এদের মিথ্যে বানিয়ে বেপথে টেনে নিয়ে গেছে। আমি বললাম—তোমরা যে যা' মনে কর না কেন—কিন্তু এটা মনে রেখ, মিয়া সাহেব আমাদের সমিতির থেকে এক পয়সা খাননি। আর তিনি খাবেনই বা কেমন করে! সমস্ত টাকা পয়সা সব যে আমার কাছে থাকতো এবং এখনও আছে। কে একজন বললো—আপনার কাছে যদি টাকা থাকবে, তবে কোথায় সে-সব টাকা পয়সা? এ-কথা শুনে আমি খুব খুশী হলাম। বললাম—মিয়া সাহেব মরে গেছেন, তাঁর নামে মিথ্যে না রটিয়ে আমার কাছে আসল কথাটা জানতে চাইলে হত। টাকা যখন সমিতির সকলের, তখন সকলেরই সমান অধিকার আছে এ-সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া। তোমরা আসল যায়গায় আসবে না—পিছে পিছে কুৎসা রটাবে! মিয়া সাহেবের নামে মিথ্যে কুৎসা রটিয়ে তোমাদের কি স্বার্থ আছে? তিনি কি ভাল করেছেন, না খারাপ কাজ করেছেন? আগে আমাদের গ্রামে কি ছিল! তখন চুরি হত, চোর ধরবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, স্কুল ছিল না, মস্‌জিদ ছিল না, কাওকে বিনা লাভে টাকা পয়সা সাহায্য করবার ব্যবস্থা ছিল না। এসমস্ত সবই তো তিনি করেছেন। তিনি গ্রামের লোকের কারও খারাপ হতে পারে—এমন কাজ কোনটা করেছেন?

—আমরা অতো কথা শুনতে চাইনে, সেই সমস্ত টাকা-পয়সা কোথায়—তাই আমরা জানতে চাই।

তাকিয়ে দেখি, সরদারের জামাই কেসমত দাঁড়িয়ে আমার দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে। আমি তখন হাসতে হাসতে বললাম—সবই হিসেব দেব; আর হিসেব দেব বলেই তো তোমাদের ডেকেছি। তবে কথা হচ্ছে কি জানো, বাবা! তুমি রাগ কর আর যাই কর না কেন, আমরা যে মহৎ কাজে দিনের পর দিন এগিয়ে যাচ্ছি, তাতে কাঁটা হয়ে আমাদের পায়ে

ঘিঁধতে আসছে তোমার খালু শ্বশুর। তুমি বাবা নিজেই বুঝে দেখ—আমরা যে কাজে এগিয়ে যাচ্ছি, সে সব কাজ ভাল—না খারাপ?

আমার কথায় সেদিন তারা কোন জবাব দেয়নি। বার বারই তারা টাকার হিসেব চেয়েছে। আমি ছিলাম পার্টির সেক্রেটারী। আমার নামে টাকা পোষ্টাফিসে জমা ছিল। তখন পর্যন্ত নগদ টাকা জমা ছিল এক হাজার সাত'শো একচল্লিশ টাকা। আমার আজও ভাল মনে আছে। আমি টাকা জমা দেওয়ার বই এনে দেখালাম। সেদিন তারা কোন রকম হাঁ-হু করে চলে গেল। এর দিন-আটেক পর একদিন একদল এসে বললো—আমরা সমিতির মধ্যে থাকতে চাইনে, আমাদের সব কিছু ভাগ করে দাও। আমি তাদের অনেক করে বুঝালাম; তারা বুঝলো না। আমি এ-ও পর্যন্ত বললাম—তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ সেক্রেটারী হও, আমি সবই তার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। তখন আর তারা কথা বললো না। একদিন গ্রামের সবায়কে ডেকে আমি বললাম—আমাকে বাদ দিয়ে অন্য লোককে সমিতির সেক্রেটারী করা হোক, আমি তার হাতে সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছি। তখন একটা মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। একদল আমাকে রাখতে চাইল, আর একদল বড় সরদারকে রাখতে চাইলো। দু' দলে সমান সমান লোক। যারা ভাল লোক ছিল, তারা সবায় জানতো—সরদারের হাতে সব ছেড়ে দিলে দু' দিনেই নিজের বাক্স ভরে ফেলবে; সমিতি যাবে গোল্লায়। আমি সবায়কে থামিয়ে বললাম—আমি সেক্রেটারী থাকতে চাইনে এবং সরদারকেও সেক্রেটারী করা হবে না। আমরা দু'জন ব্যতীত আর একজন লোককে নিযুক্ত করা হোক। তখন আমাকে যারা রাখতে চাচ্ছিল, তারা বললো—মিয়া সাহেবের ছেলে থাক। আর যারা সরদারকে রাখতে চাচ্ছিল, তারা বললো—কেসমত থাক। আমি দেখলাম—এ গণ্ডগোলের কোন মীমাংসা হবে না। কেননা, সরদার ডুবে ডুবে যে মন্ত্র এক দলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, সে দলের হাতে সমিতির কার্যভার তুলে দেওয়া মানে—আগুনে পুড়িয়ে ফেলা সমান। আর দুটো দল কোনদিন এক হয়ে একজনকে নিযুক্ত করবে না। আমি বললাম—সবায়কে বাদ দিয়ে মৌলভী সাহেবকে নিযুক্ত করা হোক। তখন বেশীর ভাগ লোক আমার কথায় মেনে নিল। চার আনা লোক মানলো না। তারা বললো—আমরা

সরদার, না হয় কেসমত—এ দু'জনের একজন ছাড়া আর কাওকে মানবো না। তোমরা যদি এ দু'জনের কাওকে না কর, তা'হলে আমাদের টাকা-পয়সা জমা জমি সব ভাগ করে দাও। আমরা আর সমিতির মধ্যে থাকবো না। আমি তাদের খুব করে বুঝালাম—এমন একটা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে গেলে আর গড়ে তোলা যাবে না। তোমাদের কয়েকজনকে যদি অংশ ভাগ করে দিয়ে দেই, তা'হলে ঐ যে ভাঙ্গন একবার ধরতে শুরু করবে, আর থামবে না; একেবারে ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যাবে। মিয়া সাহেবের কথা মত গ্রাম-রক্ষা বাহিনী তৈরী করে সেই থেকে দেখ—আমাদের গ্রামে চুরি ডাকাতি, মারামারি, দলাদলি, হিংসা-হিংসী কোন রকম দুর্নীতিমূলক কাজ হচ্ছে না। আশ-পাশ সব গ্রাম থেকে আমাদের গ্রামটা বেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আবার এ-গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোকের চেয়ে বেশ সুখে আছে। এমন প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে ফেললে পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়ে যাবে। আমি তাদের এতো করে বোঝালাম, তারা বুঝলো না। তখন আমি যারা ভাল মানুষ ছিল, তাদের নিয়ে একটা পরামর্শ করে বললাম—তোমরা যদি এ সমিতির মধ্যে থাকতে না চাও, তা'হলে টাকার ভাগ দিয়ে দিচ্ছি আর সমিতির যে জমি আছে, সে জমি বেঁচা হবে না, তার ন্যায্য মূল্য ধরে টাকার ভাগ নিতে হবে; জমি পাবে না। তখনকার মত তারা মেনে নিয়ে ছিল, কিন্তু পরে বোধ হয় শয়তানে পিঠের দাঁড়ায় কামড় ধরেছিল. তাই পরের দিনই তারা জানিয়ে দিল—আমরা টাকা এবং জমি সবের ভাগ চাই। জমির বদলে টাকা নেব না, জমির ভাগ নেব। আমি অনেক রকম চেষ্টা করে যখন তাদের বুঝাতে পারলাম না, তখন বাধ্য হয়ে সব কিছু সমিতির প্রত্যেকটি লোককে ভাগ করে দিলাম। আমি একটা পাই পয়সা পর্যন্ত নিলাম না; নিতে পারলাম না। মিয়া সাহেবের নিজের হাতে গড়া একটা মূল্যবান প্রতিষ্ঠান আমি নিজের হাতেই ভেঙ্গেচুরে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিলাম। আমি যখন ভাগ বাটোয়ারা করে দিলাম, তখন মনে করলাম যেন আমার বুকের পাঁজরা ভেঙ্গেচুরে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এই ছোট মিয়া সাহেব আর আমি কেবল কিছু নেইনি; নয়তো আর সবায় নিয়েছিল। সরদাররা কোন দিন সমিতিতে চাঁদা দেয়নি, কিন্তু তারাও ভাগ নিয়ে নিল। শেষে বললাম— আমি জানি, কে এই প্রতিষ্ঠানটা ধ্বংস

করলো। আজ বলে রাখি—অন্যায়ভাবে যে এর প্রতি অংশের ভাগ নিয়ে এটা ধ্বংস করলো, সে কিন্তু হজম করতে পারবে না, একদিন আবার উঠায়ে দিতে হবে। সেইদিন থেকে গ্রামে দলাদলি সৃষ্টি হ'ল। আমাদের দলে অবশ্য লোক সংখ্যা বেশী হল, কিন্তু তাদের সাথে আমরা কোন কাজে পেরে উঠতাম না। কেননা, তারা যে কোন কাজ করবার আগে ন্যায়-অন্যায় কিছু বুঝতো না। সেই থেকে আজও তাদের সাথে মিশ খেল না। মিয়া সাহেবের ছেলে ছোট মিয়া সাহেব এখন বড় হয়েছে, কেবল বড় হয়নি—সাথে সাথে জ্ঞান-বুদ্ধিতে গ্রামের প্রাচীনদের চেয়েও সেরা। তার বাপের নিজ হাতের গড়া প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে গেছে, তা' পুনরায় গড়বার জন্য তার যে আগ্রহ দেখি, সেজন্য আমি তার দীর্ঘায়ু কামনা করি। এই গতকাল পুকুরের পূবের পাড়ের জমি নিড়াতে যেয়ে বললো—মনে নেই? একটি মৌলভী রাখছে নাকি! সবায়কে সন্ধ্যেবেলায় পড়তে যেতে হবে। তোরা তার কথা মত চলিস, দেখিস—তোদেরই উন্নতি হবে। আজকাল দেখছো না গ্রামের বেশীর ভাগ লোকের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। জানে—আয়-ব্যয় বুঝতে না শিখে সংসারে ঢুকলে এমন অবস্থা হয়ে থাকে। দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, তোরা যদি ছোট মিয়া সাহেবের কথা মত চলাফেরা করিস, তা'হলে একদিন নিজের দেশকে ও দশকে চিনতে পারবি। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি, আমাদের আমল চলে গেছে। এবার তোরা ভাল হতে চেষ্টা কর। ওরে ও নিয়ামত! আমার কথাগুলো গিলিসনে, কাজে লাগাতে চেষ্টা করিস। তোর বাপ ছিল বুড়ো মিয়া সাহেবের ডান হাত স্বরূপ। তুই যেন ছোট মিয়া সাহেবের সঙ্গ ছাড়িসনে। তোর বড় ভাইয়েরতো ভাল মন্দ বুঝবার শক্তি নেই, এখন তোর দ্বারা যদি দু'টো ভাল কাজ হয়, তা'হলে বাপের নামটা রাখতে পারবি।

॥ ১৭ ॥

সেদিন ময়নার মা উঠোনে পা দিয়ে ডাকলো—ওরে ও নিয়ামত। বলি—কি করছিস! আজকাল তোর দেখা পাওয়া যায় না কেন? আর যাবেই বা কি করে! এ-বছর তোর ঘরে-বাইরে লক্ষ্মী এসে আসন পেতেছে যে! পাড়ার সকলের উঠোন দেখলাম, আর তোর উঠোনও দেখছি; তা' এমন ধান আর কারও হয়নি। ঘরের বৌ পেটে ধরেছে সোনার চাঁদ, আবার মাঠেও ফলেছে সোনা-দানা। তা' হবেই-বা না কেন! বাছা আমার একেবারে ভাল মানুষ। দেখ, ওর 'পরে কত জনেই না হিংসে করে, তবু বাবা চুপ করে থাকে। কারও সাথে ঝগ্গাট করতে যায় না। গ্রামের মধ্যে মানুষ আছে কেউ! মানুষ বলতে ঐ মিয়া সাহেব, বাছা আমার সব সময় তাঁকে নিয়েই চলে! ভাল মানসের সাথে ঘুরলে ভাল ফল হয়।

নিয়ামত বাড়ীতে ছিল না। সখিনা মিয়া সাহেবদের কল থেকে এক কলসি পানি নিয়ে এসে দেখে—উঠোনে দাঁড়িয়ে ময়নার মা একা একা বকে যাচ্ছে। সখিনা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললো—ও খালা! কার সাথে কথা বলছো? ময়নার মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো—কার সাথে কথা বলবো আর! তোর ছেলের সাথে বলছি! কবে যে সোনার চাঁদটা তোর কোল জুড়ে আসবে, আর আমি একটু নিয়ে আমোদ ফুর্তি করবো—আল্লা কি সে বরাত আমার ভাগ্যে লিখেছে! তা' তোর যেন ক'মাস চলছে, মা? ময়নার মার প্রশ্ন শুনে সখিনা লজ্জায় মাথা নীচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুড়তে লাগলো।

– ছিঃ! লজ্জা কিসের! আমি কি পাড়ায় ঢোল পিটিয়ে বেড়াচ্ছি? শুনলে আমার মনটা খুশীতে ভরে উঠবে।

সখিনা মাথা না তুলে কাঁখের কলসির গলা দু'হাতে পেচিয়ে ধরে আঙুল দেখালো। ময়নার মা সেদিকে তাকিয়ে বললো আমার মা-র এতো লজ্জা

যে, মুখে বলতে পারলো না। আঙ্গুল গুনে বললো—তা' ক' মাস চলছে যেন, সাত মাস ? সখিনা মাথা নাড়িয়ে জানালো—হ্যাঁ, তাই।

—তা' কবে যে একটা মাস যাবে, ভেবে পাচ্ছিনে। বাঁচবো তো সে ক'দিন! কি কপাল যে আমি করে এসেছিলাম, তা' আল্লায় জানে। একটা ছেলে হলো না, হলো একটা মেয়ে। এমন কপাল আমার, মেয়েটা নিজের হাতে মানুষ করেও যেতে পারলো না। কি ভাল মানুষ ছিল রে তোর খালু-শ্বশুর! সারা জীবন ছেলে-মেয়ের জন্য আল্লার কাছে কান্নাকাটি করে শেষ বয়সে একটা মেয়ে হলো, আর তোর খালু-শ্বশুর দু'চোখ বুজলো। অজান্তে ময়নার মার দু'চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা নোনা পানি ঝরে পড়লো। সখিনা জিজ্ঞেস করলো—খালুর জন্তে তোমার আজও দুঃখ হয়, খালা?

—তা' হয় না! এমন মানুষ আর হয় রে মা! এই একটা মেয়ে বই তো তার আর কেউ নেই! আমি কি থাকি একা একা ভাঙ্গা সংসারে পড়ে! যাবার বেলায় বলে গেল, ময়নার মা! যতদিন বেঁচে থাকো, এ ভিটে ছেড়ে কোথাও যেও না। যাবার বেলায় কত দুঃখ করে গেল তোমার খালু-শ্বশুর। বুড়ো বয়সে আল্লাহ একটা সন্তান দিল, যদি একটা ছেলে দিত, তা'হলে বাপ-দাদার ভিটে বাড়ীতে বাতি জ্বালাতে পারতো। ছেলে যখন হল না, তখন মেয়েটা নিয়ে তুমি এ ভিটের থেক। মেয়ে বড় হলে ওকে অন্যত্র বিয়ে দিও না। একটা ভাল ছেলে দেখে শুনে বিয়ে দিয়ে জামাইকে বাড়ীতে রেখ। তাই আজও দশ জনের দশ কথা শুনে শ্বশুরের এ-ভিটের পড়ে আছি, নইলে পয়লা যেদিন সরদার আমার পেছনে লাগলো, সেদিনই ভাইয়ের সংসারে যেয়ে থাকতাম। কতবার আমার ভাই নিতে এসেছে, তা' আমি যাইনি। দু'ভায়ের একটা মাত্র বোন। যদি যা'তাম, তা'হলে কত আদরে থাকতে পারতাম। কিন্তু যাই কি করে। প্রতিবারেই ভাইকে বলেছি—তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে চেও না, মাঝে মাঝে এসে দেখে যেও। তা' মা তুই বাপের বাড়ী যাবি নাকি খালাস হতি ?

—একবার মনে বলছে যাব, আবার মনে করছি আমি যদি বাপের বাড়ী যাই, তা'হলে তোমার ছেলের দেখাশোনা করবে কে ?

—তা' বাপের বাড়ী না যেয়ে এখানে থাকলে তো পারতিস। আমি না
য়ে সব করে কম্মে দিতাম।

কথা শেষ করে ময়নার মা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে আপন মনেই বললো—
বলছি তো থাকবো, কিন্তু মায়ের মন কি শুনবে! তোর মা বাপের একটা
মাত্র মেয়ে তুই, তা' আবার এই পয়লা হচ্ছে; তারা কি এখানে রাখে!
আমার শেষ বয়সে মেয়ে হলো—তখন আমার বাপ বেঁচে নেই, মা বেঁচে
আছে; আমি তোর খালু-শ্বশুরকে পাঠালাম মাকে নিয়ে আসতে। মা এ-কথা
শুনে গালে হাত দিয়ে বললেন—ওমা, সে কি! খুকীর ছেলে-মেয়ে হবে,
তা' ওখানে কেন, আমি নিয়ে আসবো। পয়লা হচ্ছে, কিছু বোঝে না;
ওখানে থাকলে হয় বাবা! আমি পাঁচদিন পর বাড়ী পাঠিয়ে দেব। সে কথা
মনে হলে মা, আমার আজও হাসি পায়। বুড়ো বয়সে মেয়ে হলো, এখনও
আমি মার কাছে খুকী! তা' সত্যি কথাই রে! মার কাছে কি ছেলে-মেয়ে
বুড়ো হয়! তা' যাস বাছা, মায়ের মন! না গেলে ব্যথা পাবে। আল্লার
কাছে দোয়া করি - তোর যেন একটা সোনার চাঁদের মত ছেলে হয়।

—ও খালা, তুমি লেখা-পড়া জানো?

—না, কেন?

—জানো না, তবে এমন কথা শিখলে কি করে?

—সে কথা বলছিস মা, আবার আমার মনের মধ্যে আগুন জালিয়ে
দিলি! কথায় বলে না—ভাল লোকের সঙ্গে থাকলে ভাল হয়, আর মন্দ
লোকের সঙ্গে থাকলে মন্দ হয়। ঐ যে ছোট মিয়া সাহেবকে দেখেছিস তো!
ওর মা ছিল খুব জ্ঞানী মেয়েলোক। এ-গ্রামের প্রায় সব মেয়েরাই তাঁর কাছে
লেখা-পড়া, নামাজ-রোজা শিখেছে।

—সবায় শিখেছে, তবে সবায় তো তোমার মত কথা বলতে পারে না!

—তা'পারবে কি করে! আমার মত আর তোর শাশুড়ীর মতো মনে
প্রাণে শিখেছে ক'জনে! মিয়া-গিন্নী খুব ভাল মেয়ে ছিলেন। যারা পড়তে
যেত, তাদের তিনি রোজই পান-তামাক খেতে দিতেন। তাই বেশীর ভাগ
মাগীরা যেত পান-তামাক খেতে।

পানি-ভরা কলসী কাঁখে করে দাঁড়িয়ে থেকে, সখিনার মাজায় ব্যথা হয়ে

গেছে। তাই সে বলছে—বসো খালা, আমি কলসীটা রান্না-ঘরে রেখে আসি।

ময়নার মা গালে হাত দিয়ে বললো—ওমা, সে কি! তুই কেমন মেয়ে গো! আমি আসা অবধি কলসী কাঁখে করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস! শিগ্গী রেখে আয়।

ময়নার মা-র কথা শুনে সখিনার বেজায় হাসি পেল। সে হাসতে হাসতে বললো—আমার কাঁখে কলসী রয়েছে, তা' তুমি এতক্ষণ দেখনি খালা?

—আমার কি আর ঐ দিকে খেয়াল আছে পাগলী! যা, আর দাঁড়াসনে; মাজা লেগে গেলে কষ্ট পাবি।

সখিনা রান্না-ঘরের দরজা খুলে প'টের উপর কলসী নামিয়ে রেখে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বেরিয়ে এলো। ময়নার মা জিজ্ঞেস করলো—নিয়ামত কই?

—ও-পাড়ায় গেছে, কার কাছে নাকি দু'টো টাকা পাবে; তাই আন্‌তে। তাকে কেন খালা?

—বলছিলাম কি! আমার ভুঁই ক্ষেত সব ভাগে ফসলে দেওয়া, সেগুলো আদায় করতে হবে তো! তা' আদায় করবে কে! এ-গ্রামে আমার আপনার মত বলতে তোরা ছাড়া আর কে আছে বল.। তাই নিয়ামতের কাছে বলতে এসেছিলাম ধানগুলো আদায় করে দিতে। খামার থেকে ভাগ করে না নিয়ে এলে সব গোলায় তুলে ফেললে আর দিতে চায় না। ভুঁই-ক্ষেত নেওয়ার সময় সবায় বলে—ধান আমরা তোমার বাড়ী দিয়ে যাব ময়নার মা, তোমার আর কষ্ট করে আমাদের বাড়ী থেকে নিয়ে আসতে হবে না। তা' মানুষ কি আর ঠিক আছে মা! এখন দেখ, বাড়ী দিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, বার বার হাটা-হাটি করেও পাওয়া যাচ্ছে না। এই দেখ না—আমার ঘরের দোরে ঝড়ির বাপের কাছে দু'খানা ভুঁই রয়েছে, কালকে ধান চা'লাম, তা' বললো কি, শুন্‌বি? বললো—তা' একটু সবুর কর। ধান-পাটগুলো সব গুছিয়ে নি'। তা' দেখছিনি মা, আমার ভুঁইয়ের ধান কেটে মলে আমার ভাগ দিবি, তার জন্যে গুছানো লাগে নাকি! আবার শুনলাম—আমার ভুঁইয়ের ধান কাটা-মলা হয়ে গেছে। তা' মা, আমার ধান না দিয়ে কি পারবে ওরা! ওদের চৌদ্দ গুষ্টির শেকড় তুলে দেব না! আমি হচ্ছি ময়নার

মা, পাড়ার বেশীর ভাগ লোকের কাছে খারাপ মেয়েলোক! যারা যা' মনে করে, তাদের সাথে তেমন ব্যবহার করতে হয়।

—ও খালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ বকবে! হাতনেয় যেয়ে বস, আমি আলো ধরিয়ে নি'।

—ও-মা, সে কি গো! রাত হয়ে গেল নাকি! তাই তো যে, আমি আর বসতে পারবো না। ময়না একা বাড়ী রয়েছে। ছেলে মানুষ, কি যে করছে, তার ঠিক নেই। তা' মা, নিয়ামত বাড়ী আসলে আমার কথা একটু বুঝিয়ে বলিস, আমি যাই!

নিয়ামত কোথায় গেছিল, সেখান থেকে এলো—তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। সখিনা ভাত তরকারি রান্না-বান্না করে সব ঢেকে রেখে ঘরে এসে কি যেন করছিল। নিয়ামত বাইরে থেকে ডাক দিল—কই, কি করছো? সখিনা স্বামীর ডাক শুনে তাড়াতাড়ি লণ্ঠন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বললো—তুমি কি রকম লোক গো! 'এই আসছি' বলে গেছ সেই বেলা থাকতে, আর এখন রাত কত হয়ে গেছে—বু'রা বোধ হয় সব খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে!—সখিনা বলতে বলতে এগিয়ে এসে দেখে স্বামীর ডান পায়ের বুড়ী আঙ্গুলের মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে। চমকে উঠে বললো—ওমা, ওকি গো! তোমার পায়ের আঙ্গুলে কি হলো!

—ও কিছু না, একটু গুতো লেগেছে—তাই রক্ত পড়ছে।

—চলো ঘরে যাই। মলম আছে, লাগিয়ে দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

সখিনা স্বামীর আঙ্গুলে মলম লাগিয়ে একটা ন্যাক্‌ড়া দিয়ে বেঁধে দিল। বললো—রাত অনেক হয়ে গেছে, বসো—ভাত এনে দিচ্ছি; খেয়ে শুয়ে পড়।

নিয়ামত ভাত খেয়ে হুকো টানতে টানতে জিজ্ঞেস করলো—তুমি ভাত খেয়েছো?

—না।

—কেন?

—শরীরটা ভাল লাগছে না।

—ছিঃ! ভাত না খেয়ে থাকতে নেই। রাতে না খেলে শরীর আরও খারাপ হয়ে যাবে; যাও খেয়ে এসো।

সখিনা রান্না-ঘরে যেয়ে অল্প দু'টো ভাত খেয়ে সব গুছিয়ে রেখে এসে শুয়ে পড়লো। নিয়ামত তখনও হুকো টানছিল। একটা লম্বা দম দিয়ে বললো–তোমার যেন কি মাসে হচ্ছে? প্রশ্ন শুনে সখিনা চোখ দু'টো পাকিয়ে স্বামী দিকে তাকিয়ে বললো—সে খোঁজ তোমার কেন!

—আমারই তো দরকার।

—তুমিও তো জানো।

—আমার কি ছাই সব সময় খেয়াল থাকে নাকি!

—সে কথা আজ এতো জানবার দরকার হ'ল কেন?

—তোমার ভাই হঠাৎ করে ক'বে নিতে আসবে—

—তাই, কি?

—তার আগে সব গুছিয়ে নিতে হবে তো!

—কি আবার গুছোবা?

—এই দেখ, নিজে যেন কিছু জানে না। অভাবের সময় তোমার সব কি নষ্ট করলাম; এখন হাতে দু'টো পয়সা এসেছে—সেগুলো তৈরী করতে হবে তো! পয়সা ফুরিয়ে গেলে বানাবো কি করে?

—কি তৈরী করবা তুমি?

—শ্রাবন মাসে সব রাক্ষসের মত খেয়ে ফেললাম, সেগুলো আবার পূর করতে হবে তো!

—সে সব তোমার আর বানাতে হবে না।

দাঁতে জিভ্ কেটে নিয়ামত বললো—তা' কি হয়! তুমি যেদিন এখান থেকে বাড়ী যাবা, সেদিন তোমাকে খালি গায়ে গাড়ীতে উঠতে দেখলে এখানকার মেয়েলোকেরা আমাকে মন্দ বলবে না! আর কেউ না বলুক, ময়নার মা তো তেড়ে আসবে। বলবে—ও নিয়ামত! তোর বাবা সখ করে ছোট বৌটা সাজিয়ে রেখে গেল, আর তুই সব নষ্ট করলি! ছিঃ! ছিঃ! তারপর তুমি যখন বাপের বাড়ী যেয়ে খালি গায়ে গাড়ী থেকে নামবে, তখন সেখানকার মেয়েলোকেরাই বা কি মনে করবে!

সখিনা স্বামীর কাছে সরে এসে পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললো—তুমি যদি আমাকে সাজাবার জন্যে গয়না তৈরী করতে চাও, তা'হলে কর না।

আর যদি লোকে মন্দ বলবে, তার জন্যে বানাতে চাও, তা'হলে বানাও। কেননা, গয়না গায় দিলেও আমার শরীর থাকবে, না দিলেও শরীর থাকবে। কিন্তু কথা হচ্ছে—লোকের কাছে তুমি যেন ছোট না হও—তাই আমি চাই।

নিয়ামত হুকোটা দেওয়ালের গায় হেলান দিয়ে দু'হাত দিয়ে সখিনাকে জড়িয়ে ধরে বললো—তাইতো তোমাকে আমি এত ভালবাসি। তোমার নিজের কথা বাদ দিয়ে সব সময় আমার কিসে যে ভাল হবে, তাই তুমি চাও।

—আর আমার ভালোর জন্যে তুমি বুঝি কিছু চাও না!

নিয়ামত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললো—তোমার কি যে ভাল করলাম, তা' ভেবে পাইনে। বাপজান মরে গেছে প্রায় বছর দু' হবে; এই দু' বছরের মধ্যে তোমায় কি-ই বা এমন দিয়েছি, আরও বাপজানের দেওয়া জিনিসগুলো খ্যায় করে ফেলেছি।

—ঐ দেখ, সেই সব কথা মনে করে এখন দুঃখ করবানে! তুমি ওসব কথা মনের মধ্যে এনো না দিনি! আমার জন্যে তুমি যা করতে চাও, তাই কর।

নিয়ামত আর কোন কথা বললো না।

সখিনা স্বামীর মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বললো—তুমি রাগ করেছো!

—তোমার 'পরে আমি কি রাগ করতে পারি! তুমি যে আমার ঘরের লক্ষ্মী।—বলে নিয়ামত স্ত্রীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা চুমো দিল।

—ছেলে মানুষির মত তুমি কি কর বলতো!

—কি করলাম আবার!

—আমাকে নিয়ে এমনভাবে টানা হ্যাঁচড়া করলে আমার কষ্ট হবে না!

—আমার কি মনে থাকে ছাই ও-সব কথা!

—দেখ, ময়নার মা একটা কথা বলছিল যে।

—কি কথা?

—বলছিল কি, তার ভুঁই-ক্ষেত লোকের কাছে ভাগে দেওয়া রয়েছে; সেই সব জমির ভাগের ধানগুলো তোমাকে আদায় করে দিতে বলেছে। খুব দুঃখ করলো, বললো—আমার এ দুনিয়াই তোরা আর এই ময়না ছাড়া কে আছে, আমার জন্যে তোরা ছাড়া আর কেউ কাঁদবে না। আমার শ্বশুর যখন

বেঁচে ছিলেন, তখন তিনি নাকি তার ভাগের ধান তুলে দিতেন। তা' এমন করে বলে গেল, তুমি একটু তার ধানগুলো তুলে দিও।

—দেব। ময়নার মা যখন যা' বলে, তখন তা' করে দিই তো। দেখ না—আমাদের কেমন যত্ন করে! খুব ভাল মেয়েলোক। তবে ওর একটা দোষ হচ্ছে, খুব বেশী বকে। এ-পাড়ায় ও আমাদের বাড়ী আর মিয়া সাহেবদের বাড়ী ছাড়া আর কারও বাড়ী বেশী একটা যায় না। পাড়ার অনেক লোক ওকে খারাপ মেয়েলোক বলে; কিন্তু আমার কাছে খুব ভাল মানুষ। নইলে আমার খালু যখন মরে গেল, তখন ও-তো মেয়েটা নিয়ে বাপের বাড়ী যেয়ে থাকতে পারতো। দু'টো ভাই ওর। তাদের বিরাট অবস্থা। তারা ও-রকম পাঁচটা বোন বসিয়ে খেতে দিতে পারে। তবুও গেল না কেবল ঐ মেয়েটার জন্যে। আগে এমন বকতো না, খালু মরে যাওয়ার পর থেকে মাথাটায় কেমন যেন একটু গোলমাল হয়ে গেছে, তাই বকে।

॥ ১৮ ॥

যেদিন সখিনা ভাইয়ের সাথে বাপের বাড়ী রওয়ানা দিল, সেদিন পাড়াশুদ্ধ মেয়ে-ছেলেরা তাদের বাড়ীতে এলো তাকে বিদায় দিতে। তারা এতোদিন সখিনার যে রূপ দেখেছিল, সে রূপের কাছে আজকের এ-রূপ যেন আরও উজ্জ্বল। গলায় সোনার ছয়গাছি মাদুলী, হাতে সোনার পেটি, নাকে রূপোর অপেল, কানে রূপোর পারশী মাকড়ী, মাজায় রূপোর বিছে, বাজুতে রূপোর তাবিজ, সিঁথিতে রূপোর সিঁথি, পায়ে রূপোর মল, পায়ের আঙ্গুলে রূপোর আংটি; এ যেন বিয়ের নুতন কনে। সখিনা যখন ঝুম্ ঝুম্ করে মল বাজিয়ে গাড়ীতে উঠলো, তখন পাড়াশুদ্ধ মেয়েরা অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। সরদারদের বৌরা পর্যন্ত হা-করে তাকিয়ে রইল। সবায় বলাবলি করতে লাগলো - সখিনা বুঝি সাত জন্মে পুণ্য করে নিয়ামতের ঘরে এসেছে। পাড়ায় তো কত বৌ রয়েছে, কার এমন কপাল! শুনি, আকবরের মামুদের নাকি বিরাট অবস্থা, সেদিন যে ওর মামীরা গাড়ীতে করে বেড়িয়ে গেল—কই, বড়লোকের বৌর গায়েও তো এতো গয়না দেখিনি! ময়নার মা আকবরের মাকে বললো—ও-বু! তোমরা তো এতো বড়লোক বড়লোক বলে বুক ফুলিয়ে বেড়াও, কই তোমাদের তো কোনদিন দেখিনি এমন গয়না গায়ে দিতে! আবজেলের মা বললো—বাদ দাও দিখি ওদের কথা! কাজের বেলায় কিছু না, নামে আবার সরদার! বুড়ো মিয়া সাহেব বেঁচে থাকতে দেখনি—ওদের কেমন কান-নাক মলে দিল! তখন তো বড়লোকি ফলাতে পারতো না, এখন কি-না পরের ফাঁকি দিয়ে দু'টো পয়সা হয়েছে। তা' পয়সা হওয়া বেরিয়ে যেত, যদি বুড়ো মিয়া সাহেব যখন মারা গেল, তখন তার ছেলে বড় হত!

আকবরের মা-আছিরণ বিবি দেখলো, তাদের কথা যখন উঠেছে, তখন তাড়াতাড়ি আর বন্ধ হবে না। তারপর সে যদি চুপ করে থাকে, তা'হলে

ওরা আরও কথা বাড়িয়ে বলবে। তাই আকবরের মা বললো—গয়না গায়ে দিলেই বড়লোক-ছোটলোক বুঝা যায় নাকি! তার চেয়ে বাক্সে টাকা থাকলেই বড়লোক বলা যায়।

ময়নার মা বললো—ওরে আমার সাধু বিবি গো! তোমার যদি থাকতো এমন গয়না, তা'হলে তুমি কি এমন কথা বলতে পারতে। থাকলে বুক ফুলিয়ে বলতে—আমারও আছে! এই বল, আর যেই বল—মিয়া-সাহেবদের বাদ দিয়ে গ্রামে বৌ থাকে তো—সখিনা, আর ছেলে থাকে তো নিয়ামত। বাপের নামটা ও রেখে যেতে পারবে।

আকবরের মা বললো—ওহ্, তোমার নিয়ামতের যদি এতোই বৌ সাজাবার টাকা থাকে, তা'হলে এবার শ্রাবন মাসে না খেয়ে মরছিল কেন?

আকবরের মার কথা শুনে ময়নার মা যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। বললো—নিয়ামত না খেয়ে মরছিল, তোমার সাথে কে বললো? গেল নাকি তোমাদের কাছে ধান টাকা চেতে? গ্রামের কোন্ মাগি বলতে পারে—নিয়ামত তাদের বাড়ী ধার কর্জ করতে গেল?

আবজেলের মা বললো—আমরা তো বু' বলতে পারবো না, আমাদের পাপ-পূণ্যের ভয় আছে, তাই আমরা মিথ্যে কথা বানাতে পারিনে; ওদের তো আর সে ভয় নেই, তা' ওরা বলবে না কেন! উচিৎ কথা বলতে গেলে মন্দ হতে হয়। অভাবটা কাদের হয়েছিল, তাই বলদিনি! অভাব হয়েছিল আকবরের বাপদের। গ্রামের লোকে মন্দ বলবে, সেই ভয়ে আনতে পারিনি; তাই আকবরের মামূরা গাড়ী ভর্তি করে ধান-চাল দিয়ে গেল—কেডা না জানে সে কথা!

—আমাদের অভাব হ'ল তোমরা কেমন করে জানো? অকারণ মিথ্যে কথা বল কেন?

ময়নার মা চীৎকার করে উঠলো—কি! আমরা মিথ্যে বলছি! ওরে আমার সাধু বিবি রে! অভাব হয়নি—তা' তোমার ভাইয়ের বৌরা শ্রাবণ মাসে গাড়ী-গরু জুড়ে নিয়ে কি করতে এসেছিল! আমরা কি জানিনে—গাড়ী করে তিন বস্তা ধান আনলো। পাড়ার মিনসেরা না হয় জানে না, তা' মাগীরা কি জানে না?

—আর জানবেই-বা না কেন, গ্রামে কোন্ লোকটাকে ওরা ঠকায়নি বলতো! ওরা অন্যায় করে বড়লোক হচ্ছে, তাই গ্রামের প্রতিটি লোকই ওদের খোঁজ রাখে। এই দেখ, নিয়ামত শ্রাবণ মাসে খেতে পাচ্ছিস না—সে কথা আমরা কেউ জানিনে, ওরা জানে। অন্যায় যারা করতে জানে, তারা মিথ্যে কথাও বলতে জানে। এমন মিথ্যে কথা বলতে জায়গা পায়নি, বলছে আমাদের সাথে, উনি যেন আমাদের চেয়েও পাড়ার খবর রাখে!

ময়নার মা বললো—তা' রাখেরে বু', যারা পরের ঠকিয়ে দু'পয়সা আয় করতে জানে, তারা প্রতি ঘরের খবর রাখে। কেন না, কার সংসারের মধ্যে একটু ছিদ্র আছে, তাই দেখে বেড়াবে। একটুখানি ফুটো যদি কারও সংসারে থাকে, তা' সেই ফুটোর মধ্যে বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে গর্ত বানাতে আকবরের বাপ উস্তাদ।

—তা, ঠিক কথাই বলছিসরে বু', ঠিক কথা বলছিস। ওদের কাজ ফুটো খুঁজে বেড়ানো। মিনসেরা খুঁজবে বাইরে, আর মাগীরা খুঁজবে ভেতরে। নিয়ামত বৌর ভাল ভাল গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, বৌ গা-ভরা গয়না নিয়ে বাপের বাড়ী যাচ্ছে—এটা উনার সহ্য হচ্ছে না; তাই মুখ ফুটে বলতে না পারলেও মিথ্যে কথা বলে ওর মন্দ টেনে আনতে চাচ্ছে—সেটা কি বু' আমরা বুঝিনে! বুঝেই-বা আর কি করবো! যাদের লজ্জা সরমের বালাই নেই, তাদের বলবোই-বা কি, আর করবোই-বা কি! থাকতো যদি আজ বুড়ো মিয়া সাহেব, তা'হলে দেখতাম এতো বড়াই ওরা কি করে করতো!

করিমন বললো—ও আবজেলের মা! তুই থামদিনি, আকবরের বাপ-চাচারা অন্যায় করে, তাই বলে ওর মাকে যা-তা বলিস কেন?

—কি বললি বু!' আকবরের মা অন্যায় করে না? নিয়ামত খেতে পেত না—এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা যে বললে, সে আবার ভাল কিছু করতে পারে নাকি!

করিমন আর কোন কথা বললো না। সে নিজেই জানে, সরদারদের স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে প্রতিটির সভাব চরিত্র এক রকম। তবু সে উপস্থিত থেকে দু'এক কথা না বললেই-বা মানায় কেমন করে! পাশাপাশি বাড়ী, কিছু না বললে মনে মনে হয়তো রাগ থেকে যাবে। সে দেখলো—যতক্ষণ এখানে

দাঁড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণ এদের মুখের কথা ফুরোবে না। আবার আকবরের মা-ও বাড়ী যেতে পারছে না, চলে গেলে তো ওদের মুখ আরও বেশী করে খুলে যাবে। আর যাবেই-বা না কেন! অন্যায় যারা করে, তাদের বিরুদ্ধে সবার অভিযোগ থাকবে—সে তো স্বাভাবিক! সে বললো—চল্, বু, বাড়ী যাই, বেলা আর বেশী নেই; বাড়ীতে অনেক কাজ রয়েছে। করিমন তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। আকবরের মা ভিড় ঠেলে বাইরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। করিমন তাকে খুশী করবার জন্যে বললো—ওনারা নিজের ফুটো দেখবে—না পরের ফুটো খুঁজতে যাবে। ময়নার মা ভাল লোক মনে করছো? গ্রামে কে না জানে ময়নার মা খারাপ মেয়েলোক—কি ভাল মেয়ে লোক! কোন্ কালে ময়নার বাপ মরে গেছে, মাগী এখনও সেই সংসার আকড়িয়ে ধরে পড়ে রয়েছে। কেন রয়েছে, তা' কি কেউ জানে না! এক গাদা 'নাঙ্' জুটিয়ে রেখেছে। রাত দিন দেখ না কত ছোড়ারা ওর বাড়ী ঘুর ঘুর করে। ও বলে কি-না—বুড়ো হয়ে গেছি, আর ক'দিনই বা বাঁচবো! যে ক'দিন বাঁচি, স্বামীর সংসারে থেকে মেয়েটা মানুষ করে ভাল যায়গায় বিয়ে দিতে পারলে সুখে মরতে পারবো। ওরে আমার ভাল মানষের মেয়েরে! বুড়ী হলে আবার ছোড়াদের দিয়ে ডুব মারে নাকি! আমরা জানিনে—ময়নার বাপ যখন মরে গেল, তখন তার মাকে নিতে এলো ভাইয়েরা, গেল না। আর যাবেই-বা কেন! বাপের বাড়ী গেলে তো সাত 'নাঙ' জুটাতে পারবে না! আর মাগীর এমন বুদ্ধি—যত যুবক ছেলেদের সাথে খাতির! লোকে ভাববে, ও হচ্ছে বুড়ো মানুষ—আর ছেলেপেলে ওর বাড়ী ঘুরলে ক্ষতি কি! কিন্তু আমরা মেয়েলোক, আমরা বুঝিনে ও বয়সের মেয়েরা যুবক ছেলেদের সাথে মিশতে আরাম পায়? ডুবে ডুবে পানি খেয়ে পাড়ার ছেলেদের মাথা খেয়েছে। ঐ নিয়ামত ছোড়াটাকে এতো ভালবাসে কেন! ঐ ছোড়াই তো ওর এক নম্বর 'নাং'। নিজে সাত জনের রক্ত চুষে খেয়ে বুড়ো হয়ে গেছে, আবার ঘরে ধাঙ্গড় মেয়েটা পুষে রেখেছে পাড়ার ছেলেদের মাথা খাওয়ার জন্যে। ও বু'! বলবো কি—পাড়ায় থেকে, সমাজে বাস করে যেন ব্যবসা আরম্ভ করেছে। নইলে মাগী বুড়ো হয়ে গেছে, তবু কাপড় চোপড়ের বাহারটা দেখ! আর ছুড়ীটা যেন লাট্ সাহেবের মেয়ে। পায়

কোথায় এ-সব ! আমাদের সংসারে খাটবার মানুষ আছে, ভুঁই-ক্ষেত রয়েছে ; তবু আমরা একখানা গয়না তো দুরের কথা, একখানা ভাল কাপড়ও পরতে পারিনে। আবার মাগী তোদের কথা বলে কি-না—খারাপ কাজ করে পয়সা আয় করে। কিন্তু আমি জানিনে কে খারাপ পথে পয়সা আয় করে ! জেনে-শুনে করবো কি ! মিনষেরা তো বুঝবে না ! আমরা বুঝে কিছু করতে পারলে এতোদিন ঠাণ্ডা হয়ে যেত না ! যদি কারও সাথে বলি, তা'হলে বলবে কি—পরের ঘরের খবর তুমি রাখ কি করে ! তা'হলে তুমিও ভাল মেয়ে না। সে-কাল কি আর আছে বু' ! এ-কলিকাল ! এ-কালে কত দেখলাম, আরও কত দেখবো ! যাই বু', আমার অনেক কাজ পড়ে আছে ; ওদের কথা বললে তো আর পেটে ভাত যাবে না !

করিমনের স্বামীর অবস্থা খুব ভাল না। সরদারদের ঘরের পাশেই ওদের ঘর। পাশাপাশি বাস, মাঝখানে মাত্র একটি কলা বাগান। তাই পাকে-প্রকারে একজনে অন্যজনের সাহায্য করে। তার স্বামী বদর জন-মজুরী খাটে। বছরের বেশীর ভাগ সময় সে সরদারদের বাড়ীতেই কাজ করে। তাই সরদার মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করে। তবে বিনা স্বার্থে নয়। সরদার খুব চালাক লোক। বদরের হাতটান হলে, তার কোন বিপদ-আপদ দেখা দিলে সরদার বেশ কিছু টাকা দিয়ে উপকার করে, বদলে একখানা জমি রাখে। এমন করে দিতে-রাখতে বদরের জমাজমি প্রায় সবই গ্রাস করে নিয়ে নিয়েছে। তবু বদর বুঝতে পারে না কিছু। বদর বুঝলেও কিছু করতে পারে না। বাঁঝা স্ত্রী করিমন। তার চার ছেলে-মেয়ে। তবু তার স্বামীর, পরে একটু মহব্বত নেই। স্বামী কাজ করে সরদারদের বাড়ী, আর সে সরদারের ছোট ভাই জুড়নের নিয়ে পড়ে থাকে। চার সন্তানের মধ্যে একটিই বদরের বলা চলে, আর তিনটি যেন জুড়নের ! স্বভাবটা তাদের উভয়েরই সমান। এ-কথা তারা দু'জন ব্যতীত আর কেউ জানে না। আর জানবেই-বা কি করে ! তাদের ঘরটা এমন যায়গায়, সেই ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করলেও বাইরের কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। জুড়ন সময় পেলেই সেখানে যেয়ে রঙ্গ লীলায় মেতে যায়। অবশ্য বাইরের লোক কিছু মনে করতে পারে না। কেননা, জুড়ন যখন যায়, তখন বদরকে ডাকবার অছিলায় যায়। বাইরে থেকে একবার ডাক দিল—ও বদর

ভাই, বাড়ী আছো? বদর অবশ্য কোথায়, তা' তার জানা আছে। এ ডাকটা হচ্ছে একটা সাড়া। করিমন গলার আওয়াজ পেয়ে বলে – হ্যাঁ, বাড়ী আছে, এসো। এ-সব হচ্ছে চালাকি! বাইরের কেউ শুনতে পেলে মনে করবে— জুড়ন বদরের কাছে গেছে দরকারে। আর না দেখতে-শুনতে পেলে তো ভালই হ'ল। জুড়নের সাথে ভাব জমিয়ে করিমনের টানাটানির সংসারে যে কষ্ট হত, সেটা আর হয় না। কেননা, চুরি করে তার জন্যে চাল, টাকা-পয়সা এনে দেয়। তার বড় ভাই এবং ভাবী কিছুই বুঝতে পারতো না। আর পারবেই বা কি করে? কলে ধান ভানতে গেলে তার থেকে কিছু মেরে ফেললো। সুযোগ পেলে পয়সা-কড়িও বাক্সের মধ্যে থেকে সরিয়ে ফেললো। আবার ভাদ্র মাস এলে তো আরও সুযোগ। খামারে ধান থাকে, তা' সারতে বেশী বেগ পেতে হয় না। তা'ছাড়া ছোলা-মশুরী-কলাই যখন যা বাড়ী আসে, তখন তা-ই সরিয়ে করিমনের দিয়ে আসে। বদর সারা মাস খেটে যা আয় করে, করিমন নিজের দেহ বিক্রী করে জুড়নের কাছ থেকে তার চেয়ে বেশী আয় করে। পাড়ার অন্যান্য গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের চেয়ে খেয়ে-পরে সে থাকে ভাল। তাই স্বামী যদি সরদার বাড়ী কাজ করতে অস্বীকার করে, তা'হলে সে তেড়ে উঠে। তার স্বামীর যে জমা-জমি ছিল, তা' সব সরদাররা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে—তা-ও সে জানে। কিন্তু জুড়নের প্রেমে সে এমন করে মজে গেছে যে, ক্ষতির কথা মনেই করতে পারে না। সে ইচ্ছা করেই এ-পথে নামেনি। জুড়ন ঘন ঘন তাদের বাড়ী আসতো আর বেরিয়ে যেত। তবে কোন সময় খালি হাতে আসতো না। কিছু না কিছু হাতে করে আসতো। করিমনের প্রথম প্রথম তার কাছ থেকে কিছু নিতে লজ্জা করতো। জুড়ন বলতো—আমায় কি তুমি পর মনে কর ভাবী! বদর ভাই আমাদের বাড়ী কাজ করে বলেই তো তোমাদের মাঝে মাঝে দেখা-শোনা করতে আসি। আর ভাই সারাদিন খেটে আমাদের খাওয়ায়। তোমার স্বামী খেটে আমাদের খাওয়াবে আর তুমি না খেয়ে থাকবে! সে কি কথা! তাই মাঝে মাঝে তোমার জন্যে কিছু নিয়ে আসি। তা' তুমি যদি না নিতে চাও, তা'হলে বল—আমি আর আসবো না। সেদিন থেকে করিমন লজ্জার মাথা খেয়ে জুড়ন যা দিত, তাই নিত। নিতে নিতে কথা বাড়লো, হাসি বাড়লো, তারপর একদিন জুড়ন তাকে জড়িয়ে

ধরলো। সেদিন সে কিছু বলতে পারলো না। কেননা, এতদিন সে তার দেওয়া অনেক কিছু ব্যবহার করেছে, আবার তারই জন্যে সে দু'বেলা পেটপুরে খেতে পেয়েছে। তারপর পর-পুরুষের বুকের মধ্যে পড়ে তার সারা দেহে একটা প্রবল কম্পন শুরু হ'ল। সেই কম্পনে সে ধ্বংসে পড়লো জুড়নের দেহের নীচে। আবার তার স্বামী বদরও যে চরিত্র ঠিক রেখেছে, তা' নয়। জুড়নের ছোট বোন জামেনা সাত-ঘর ভেঙ্গে শেষে ভাইয়েদের সংসারে এসে রয়েছে। সে-ই বদরের মাথাটা খেয়েছে। পাড়া-গাঁ। বাড়ীর আশপাশে বাঁশ বাগান ও কলা-বাগান। কোথায়, কে কি করছে না করছে, বাইরের লোক খোঁজ নিতে পারে না। জুড়ন যেমন বদরের ঘর ভাঙ্গছে, বদর তেমন তাদের মুখে চুন-কালি মাখাচ্ছে। অবশ্য, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

॥ ১১ ॥

সেদিন আছিরন বিবি রাতে ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে স্বামীর কাছে যেয়ে বললো—তুমি কি রকম লোক গো ?

সরদার তখন আপন মনে হুকো টানছিল। স্ত্রীর কথা খেয়াল করে শোনেনি।

স্ত্রী এবার বেশ রাগ-মিশ্রিত কণ্ঠে বললো—বলি শুনছো, না শুধু শুধু তামাক টানবা!

সরদার চমকে উঠে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো—এঁ্যা, কি বলছো ?

—বলছি, হাতী-ঘোড়া।

—কেন, কি হ'ল আবার!

—বলি, বুড়ো হয়ে গেলে, তবু তোমার বুদ্ধি-জ্ঞান হ'ল না, আবার কবে হবে, তা' ভেবে পাইনে।

তামাক টানতে টানতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সরদার বললো—এতো রাতে তোমার আবার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!

কি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিল, বিষয়টা হচ্ছে—নিয়ামতের উত্তর মাঠের বিলের জমিটায় এবার যে ধান হয়েছে, এমন ধান গত কয়েক বছর ধরেও গ্রামে কারও হয়নি! তাই সরদারের লক্ষ্য ঐ জমিটার উপর। কিভাবে জমিটা হাত করা যায়, সেই চিন্তায় সরদারের আজ এক সপ্তাহ ধরে ভাল ক্ষিদেও লাগছে না, ঘুমও হচ্ছে না। তবে এই এক সপ্তাহ ধরে তামাক ধ্বংস হচ্ছে আগের নিয়মের চেয়ে বিশগুন বেশী। নিজে একটা পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তারপর আবার স্ত্রীর অর্থহীন কথা। বিরক্ত হয়ে সরদার বললো—তুমি যাও দেখি, শুয়ে পড় যেয়ে—আমায় এখন জ্বালিও না।

—আমি একটা কথা বললেই তোমার হাড় জ্বলে যায়, আর ওদিকে বাইরে যে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলাবলি করে, তা' তোমার কানে ঢোকে না ?

—কেন, কে কি বলে?—স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সরদার।

—বলবে কি, তোমার গুণ গেয়ে বেড়ান। গুণধর মানুষ তুমি, তোমার জন্যে কোথাও বেরুবার জো'নেই।

—কেন!

—পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। আজকে দেখ—নিয়ামতের বৌ বাপের বাড়ী গেল, তাই গেলাম দেখ্‌তে; ওরে বাবা! বৌ তো নয়, যেন লাট সাহেবের বেগম গেল! তাই নিয়ে ময়নার মা আর আবজেলের মা আমাকে যা' না হবার, তাই বললো।

—কি বললো?

—বললো, তুমি নাকি বড়লোকি চাল দেখাতে যাও, অথচ তোমার বৌ, ছেলে-মেয়েদের ভাল কাপড়-চোপড় দিতে পার না; একখানা গয়না পর্যন্ত কারও দিতে পারনি। আবার শ্রাবন মাসে খেতে পাওনি, শ্বশুর বাড়ী থেকে গাড়ী ভর্তি করে ধান-চাল নিয়ে এসেছো! শুধু কি এই সব! আরও কত কি! সে-কথা কি বলা যায়!

—কি বলেছে বল!

—তোমার সম্বন্ধে সে অনেক কথা—কার সংসারে ফুটো আছে, তুমি তাই খুঁজে বেড়াও। লোকের সর্বনাশ করে বাক্সে টাকা ভর্তি কর।

—এ-সব কে বলেছে, বললে!

—ময়নার মা আর আবজেলের মা।

—কার বাড়ী?

—নিয়ামতের বাড়ী।

—তুমি তাদের বাড়ী গেলে কেন?

—গিইছি, তাই কি দোষ হয়েছে। পাড়ায় একটা বৌ মেয়ে গেলে কেউ যায় না!

—আমাদের সাথে যখন কারও বনিবনা হয় না, তখন তুমি কারও বাড়ী না গেলেই পার।

—আমরা যদি কারো বাড়ী না যাই, তবুও কারও মুখ বন্ধ হবে না। তা'ছাড়া এমন করে চুপচাপ থাকলে আমরা না হয় চালিয়ে যেতে পারবো,

কিন্তু আমাদের ছেলে-মেয়েরা! পাড়ার যে ভাব দেখছি, তাতে তারা কারও কাছে মুখ পাবে না।

সরদার এবার যেন সত্যি সত্যি রেগে উঠলো। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না। কেন না, সে নিজেই জানে—অন্যায় করেই সে বড় হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে! তাই সে চুপ করে রইল।

স্বামীকে চুপ করে থাকতে দেখে আছিরন বিবি স্থির থাকতে পারলো না। বললো—আজ নিয়ামতের মত ছোড়ার বাড়ী যেয়ে যা না হবার, তাই শুনে এলাম, আর তুমি মুখ বুঁজে সব হজম করছো! মা-বাপ এমন অকম্মা মিন্‌সের সাথে বিয়ে দিল, সেই দুঃখে আর বাঁচিনে। শোন, এর প্রতিকার যদি তুমি না কর, তা'হলে আমার ভাই এলে এবার চলে যাব। যার কোন মুরোদ নেই, তার বাড়ী না থাকলেও আমার চলবে।

—তুমি চুপ কর দেখি, কি এ-সব ছেলে মানসির মত বক, বল দিনি! নিয়ামতের বাড়ী যেয়ে তুমি অপমানিত হয়ে এলে, আর আমি চুপ করে থাকবো মনে করেছো! এর প্রতিকার করে তবে আমি ছাড়বো? এমন কলে ফেলবো, তখন বাছাধনের আর স্ত্রীর গা-ভরা গয়না দিতে হবে না।

—তাই যেন হয়! নইলে আমি একদণ্ডও তোমার বাড়ী থাকবো না। মণ্ডলদের মেয়ে আমি, এ-সব কথা আমার বাপ-দাদার চৌদ্দ পুরুষের কেউ শোনেনি, আর আজ কি-না তোমার ঘর করতে এসে শুন্‌তে হল। আর যেন শুন্‌তে না হয়!

কথা শেষ করে আছিরন বিবি দম্ দম্ করে পা ফেলে ঘরের মধ্যে যেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে-পড়লো।

সরদার যে চিন্তা করছিল, সেইদিকে আবার ফিরে গেল। সেদিন সমস্ত রাত আর তার ঘুম হল না। কলকের পর কলকে তামাক ধ্বংস করেছে আর কি করে নিয়ামতের আমন ধানের বড় বন্দটা নেওয়া যায়, তাই চিন্তা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। এমনিভাবে দিনের পর দিন গেল সরদারের অনিদ্রায় আর চিন্তায়। সেদিন হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় গজিয়ে উঠলো। নিয়ামত বাড়ী ছিল না। আগের দিন বিকালে গেছে শ্বশুর বাড়ীতে। জুড়নকে পাঠিয়ে দিল আসমতকে ডেকে আনতে। আসমত সকালে ভোরে

উঠে পশ্চিম মাঠের বিলে চেরো পাতা ছিল, তাই তুলে নিয়ে কেবল বাড়ী এসেছে। এমন সময় জুড়ন যেয়ে বললো—মিয়াভাই ডাকছে।

—যাও, আসছি। -বলে আসমত হাত মুখ ধুয়ে দু'টো পান্তাভাত উদরস্থ করে সরদার কি বলছে, শুনতে গেল। আসমত যেয়ে হাতনের ড'র কান্দায় দাঁড়াতেই সরদার বললো—এই যে আসমত এয়েছো—এসো, বসো। সরদার হাতের হুকোয় বার কয়েক টান দিয়ে একটা লম্বা দম ছেড়ে আসমতের দিকে এগিয়ে দিল! আসমত হাত বাড়িয়ে হুকোটা নিয়ে টানতে টানতে জিজ্ঞেস করলো—তা' সরদার ভাই, কি করতে ডাকলে?

সরদার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললো—ডাকলাম তো ভাল কথা বলবার জন্যে। আমার কথা যদি উল্টো বোঝ, তা'হলে কিন্তু বলবো না!

—বল শুনি!

—খেয়াল করে শুনে ভাল করে বুঝে দেখে—আমি ঠিক বলছি কি খারাপ বলছি, তাই বল।

—কথা হচ্ছে,—আমি তো খারাপ লোক। গ্রামের সব লোকই বলে—সরদাররা ওর সর্বনাশ করেছে, ওর মাথা খাচ্ছে; তাই কারও ক্ষতি হতে দেখলেও কিছু বলিনে। তোমাদেরও যে ক্ষতি হচ্ছে, তা' আমি টের পাচ্ছি অনেকদিন থেকে। তা' বলতে সাহস করছিনে। কি জানি, কি বুঝতে যেয়ে কি বুঝে ফেল্‌বে, আর বলবে—ঐ সরদার আমার দফাটা সারলো। কিন্তু আর না বলে পারলাম না! আর না বলে থাকিই বা কি করে! দাদা যখন মরে গেল, তখন আমার বাপ খুব ছোট! আমার বাপের দেখবার মত কেউ ছিল না। তখন তোমার দাদা বেঁচে ছিল। তোমার দাদার হাতেই আমার বাপ মানুষ হয়েছে। তাই তোমাদের সাথে কোন আত্মীয়তা না থাকলেও এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠলো, তা' আপনের চেয়েও বড়। সে-কথা বোধ হয় তুমি জান। আর জানেই-বা না কেডা? আজকে দেখ—তোমার বাপ মরে গেছে ক'বছর হ'ল, তা' আমার কি একটুও দুঃখ লাগে না! লাগলে কি করবো! কিছু বলতে গেলে যে খারাপ হয়ে যাই। কেননা, তোমার দাদা মরে গেলে তোমাদের সাথে আমাদের বনি-বনা আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যায়। তোমার বাপের সাথেও আমাদের বনি-বনা ছিল, শেষে কি-না

মিয়া সাহেবের জন্য তোমার বাপ আমাদের ছাড়লো, তবু কি ছেড়েছিল? বাপজান মরে গেলে আমরাও এক প্রকার তোমার বাপের হাতে মানুষ। তখন আমি না হয় একটু বড় ছিলাম, কিন্তু জুড়ন যে তখন কোলে। সে তো তোমার বাপের হাতেই মানুষ। তোমাদের ছেড়ে থাকলেও সে-সব কথা কোন দিন ভুলিনি এবং ভুলবোও না। এক প্রকার ধরতে গেলে তোমাদের কাছে আমরা ঋণী। তাই তোমার ক্ষতি দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। মনে মনে স্থির করলাম—লোকে যদি খারাপ ভাবে, আর আসমত যদি মন্দ ভাবে, তা' ভাবুকগে, আমি বলেই দেখি। ঋণ যখন আছি, তখন আমার কর্তব্য তো করে যেতে হবে। তোমার বাপ মরে গেছে আজ বোধ হয় বছর দুইর কিছু বেশী হয়েছে। তোমরা মাত্র দুটো ভাই, তা' একটি বছরও এক সাথে থাকতে পারলে না! আমার বাপজান মরে গেছে আজ বোধ হয় বছর পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। সেই থেকে আমরা দুটো ভাই একত্রে আছি। জুড়ন এখন বড় হয়েছে, বিয়ে দিয়েছি। তবু সংসারের কাজ করতে চায় না, কি করবো! ছোট ভাই, বাপ-মা ছোট বেলায় মরে গেছে, তাই কিছু বলতে পারিনে! তাই বলে ওর ইচ্ছামত আমি কিছু করিনে বা ওকে করতেও দেইনে। আর তোমরা দুটো ভাই দু'দিন না যেতে অমনে আলাদা হয়ে গেছো। তা' আবার ছোট ভাইকে জমি-ক্ষেতের, এমন কি সব জিনিষের সমান ভাগ দিয়ে দিয়েছ। নিয়ামত ছেলে মানুষ, অল্প বয়সে মেলা জমাজমি হাতে পেয়েছে; দেখ—সব খ্যায় করে ফেলবে। যারা সংসার কি জিনিস বুঝতে শিখেনি, তাদের হাতে রাজ্য দিলেও তারা রাখতে পারে না। কি করে পারবে! আমার দাদা মরে গেলে বাপজান ছিল ছোট, তাই তোমার দাদা নিজের হাতে আমাদের সব দেখা-শোনা করতো। ক্ষেত-খামার সব তোমার দাদার হাতে ছিল! তোমার দাদা মরে যাবার আগে সব আমার বাপজানের বুঝিয়ে দিয়ে গেল। যদি তোমার দাদা নিজের হাতে সব না রাখতো, তা' হলে আজ আমাদের ভিক্ষে করে খেতে হত। রত্নাকরের সামনে মাণিক পড়লে সে কুড়িয়ে পকেটে পুরবে, আর তোমার আমার সামনে পড়লে খাবরা বলে ফেলে দেব। বেশী কথা আর কি বলবো! নিয়ামতের যে ভাব দেখছি, তা' সে বেশী দিন জমি-ক্ষেত রাখ্‌তে পারবে না। কেননা, ঘরে ধান

উঠতেই দেখলে না—সব বিক্রী করে বৌর গয়না গড়িয়ে দিল! বাপ-মা'র নিজের হাতে গড়া জমি-ক্ষেতের 'পরে যদি মায়া থাকতো, তা'হলে এমন করে টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিতে পারতো! নিয়ামত তো আর রাজার মেয়ে ঘরে নিয়ে আসেনি যে, গা-ভরা গয়না দিতে হবে! কি দরকার এ-সব দিয়ে! হয়তো শ্বশুর শাশুড়ী দেখে একটু খুশী হবে। তা' তারা খুশী নাই-বা হলো, তাতে নিয়ামতের যায় আসে কি! সে তো আর তাদের খেয়ে পরে মানুষ হচ্ছে না! দিয়েছে তো অতো টাকা খরচ করে গয়না গড়িয়ে, যদি শালার বৌ সে-রকম হয়, তা'হলে দু'টো একটা সেরে ফেলে দিলে—ব্যাস্! বৌ বাড়ী এসে বলবে—হারিয়ে গেছে। কি করবে তখন নিয়ামত! আমাদের টাকা-পয়সা নেই, আমরা পারিনে অমন গা-ভরা গয়না দিতে। কিন্তু দিয়ে লাভ কি! অনর্থক টাকা খরচ করার কোন মানে হয়! তুমিও তো তার ভাই, আরও বড়। ক'খানা গয়না দিয়েছো গড়িয়ে! তুমি হচ্ছো বাপের বড় ছেলে। জমি-ক্ষেতের 'পরে তোমার মায়া-মহব্বত আছে, তাই অকারণ টাকা ব্যয় করে বৌ সাজাও না। তাই বলছিলাম কি—ওকে আলাদা করে দিয়েছো যখন, তখন ও আলাদাই থাক। তবে জমি-ক্ষেত তুমি দু'খানা বেশী করে হাতে রেখে দাও। নইলে ও সব নষ্ট করে ফেলবে। অল্প বয়েস, রক্ত গরম! বৌ যা বলবে, তাই করবে। তোমার বাপ যে সব জমি-ক্ষেত রেখে গেছে, তেমন জমি কার আছে এ-গ্রামে! ও-সব নষ্ট না করে তুমি কিছু বেশী করে হাতে রেখে দাও। তারপর ও যখন বুঝতে শিখ্‌বে, তখন ওকে সমান ভাগ দিয়ে দিও।

সরদার আর এক সিলিম তামাক সেজে টান্‌তে টান্‌তে বললো—আমি ঠিক কথা বলিনি!

আসত মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বললো—তা' সরদার ভাই, বলছো তো ঠিকই; কিন্তু···

—কিন্তু কি?

—ওকে একবার ভাগ করে দিয়েছি, আবার কেমন করে নিয়ে নেব! এখন নিলে লোকে বলবে—দেখেছো, ছোটটার ধান ভাল হয়েছে বলে জমি-ক্ষেত কেড়ে নিচ্ছে।

—লোকে তো বলবেই। আচ্ছা, লোকের কথার ভয়ে তুমি যদি চুপ্ করে থাক, তা'হলে নিয়ামত যখন সব খ্যায় করে ফেলবে, তখন লোকে কি সে সব দেবে!

—তা কি দেয়!

—তবে লোকের কথা তুমি শুনবেই বা কেন!

—মিয়া সাহেব থেকে সব ভাগ করে দিল, আবার—

—ওরে তোমার মিয়া সাহেব! মিয়া সাহেব তো ছেলে মানুষ! ও বোঝেই বা কি, আর জানেই বা কি! বুঝতো ওর বাপ। ওর বাপ বেঁচে থাকলে কি তোমাদের ভাগাভাগি হতে দিত। ওর মাথায় বুদ্ধি থাকলে কি আর ও এদিক ওদিক ঘুর্ ঘুর্ করে বেড়ায়! ওর বাপ এতো বড় তালুক রেখে গেছে, সে সব থাকতে ছোড়া কোথায় অমুকের সাথে এ-মিটিং, অমুকের সাথে ও-মিটিং করে বেড়াচ্ছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ যে তাড়ায়, সে বোকা ছাড়া আর কি হতে পারে!

—এতো কিসের মিটিং করে মিয়া সাহেব!

—কি ছাই ভস্ম মিটিং করে, সে খোঁজ কেডা রেখে বেড়ায়! শুনি নাকি খৃষ্টানদের এ-দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে মিটিং করে। বলে. শোন না—তোমরা আর অন্ধকারে ঘুমিয়ে থেক না। একটু আলোকের সন্ধানে জাগো। গোলামীর হাত থেকে বেঁচে স্বাধীনভাবে দিন যাপন করবার জন্যে এসো ভাই সব, আমরা একতাবদ্ধ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করি। ওরে ভাই, বোকা যদি বলতে হয়—তো এদের। আমাদের জাগতে বলছে, কেন আমরা কি ঘুমিয়ে আছি নাকি! আমরা খাটবো, আমরা খাবো; খৃষ্টানরা খাটছে, তারা খাচ্ছে। আমরা তাদের খেতে দিচ্ছিনে, আবার তারাও আমাদের খেতে দেবে না। সংসারের কাজ কর্ম বাদ দিয়ে ওর পাছ পাছ ঘুরে বেড়াও—এমন পাগল আমরা হইনি। আমরা চাষা মানুষ, চাষ করেই আমাদের খেতে হবে; তা' খৃষ্টানরা থাকলেই বা আমাদের কি, আর না থাকলেই বা আমাদের কি! ওদের কি বুদ্ধি বিবেচনা বল্‌তে কিছু আছে নাকি! ওরে বুদ্ধি যদি থাকবে, তবে তোমাদের আলাদা করে দেবে কেন! ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হতে চাইলে ভাল লোকে নিষেধ করে; আর উনি নিজের হাতে তোমাদের সব কিছু ভাগাভাগি করে

দিল ! একত্রে থাকলে যে বল থাকে, সত্তার হয়ে গেলে কি সেই বল থাকে ! যদি নিয়ামত আর তুমি একত্রে থাকতে, তা'হলেও কি এমন করে ধান-পাট বেঁচে টাকাগুলো বাজে খরচ করতে পারতো ! সব তোমার হাতে থাকতো। দুনিয়ায় বাস করতে হ'লে টাকা পয়সার দরকার। বলা তো যায় না, কখন কি বিপদ এসে পড়ে। তোমাদের পৃথক হওয়ার কারণটা কি, তা' আমি আজও খুঁজে পেলাম না। শুনেছি নাকি বড় বৌ একটু বকাবকি করতো, নিয়ামতের 'পরে তাই রাগ করে মানুষ ডেকে আলাদা হয়ে গেছে। তা' একত্রে বাস করতে হলে এমন বকাবকি হয়েই থাকে। তা'ছাড়া বড় ভাই, ভাবী একটু গাল-মন্দ দিনই-বা ! কারও সাথে গোলমাল বাঁধলে কত গালাগালি হয়ে থাকে, তা' পরের লোকের কাছে গাল খাওয়া যায়, আর ঘরের মানুষ যদি দু'টো কথা বলে, তা'হলে আর সহ্য করা যায় না। এ কলিকাল ভাই, কলিকাল। ডেকে এনে ভাল কথা বললাম, এখন তুমি যদি উল্টো বোঝ, তা'হলে আমি কি করতে পারি ! তবে তোমার ভালর জন্যেই বললাম, আজ না বুঝতে পার—দু'দিন পরে বুঝতে পারবে। বাড়ী যেয়ে চিন্তা করে দেখ—আমি মন্দ কথা বলেছি, কি ভাল কথা বলেছি।

সেদিন সখিনা কত গা-ভরা গয়না গায়ে দিয়ে বাপের বাড়ী যায়। সেদিন রাতে পরিছন তার স্বামীকে আচ্ছা করে গাল দিয়ে ছেড়েছে। কথা হচ্ছে, এক মা'র পেটের দু'ভাই ; নিয়ামত আলাদা হয়ে বৌর ভাল ভাল গয়না গড়িয়ে দিতে পারলো, আর তুমি আমার কি দিয়েছ ! আমি কোন্ যুগ্ গি এ বাড়ীতে এসেছি বৌ হয়ে। আর সখিনা সেদিন এলো, আর সে কি-না আজ রাজ-রাণীর মত সেজে বাপের বাড়ী গেল ! এমন অকম্মা মিন্সের ঘর করতে আমি আইছি—সেই দুঃখে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। স্ত্রীর তিরস্কার শুনে আসমতের মনটা এমনই ক'দিন খারাপ ছিল, তারপর আজ আবার সরদারের কথায় তার মিজাজটা সত্যি হিংসায় জ্বলে উঠলো। তার আপন ভায়ের জন্যে ঘরের স্ত্রী পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছে না—এটা সে বেশ বুঝতে পারলো। আসমত কোন কথা না বলে আসন ত্যাগ করে বাড়ী গেল। পরিছন তখন গোলাভাড় হাতে নিয়ে রান্না-ঘর লেপতে যাচ্ছিল, স্বামীকে বাড়ী আসতে দেখে ভাড়টা ছেচেয় রেখে উঠোনে নেমে এলো। বল্লো—সরদারদের

সাথে তোমাদের কোনদিন বনি-বনা হয় না, আবার আজ যে দেখছি ডেকে নিয়ে গেল, ব্যাপার কি?

আসমত তখন চিন্তায় মগ্ন ছিল, স্ত্রীর কথা খেয়াল করে শোনেনি।

পরিছন তার স্বামীর গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো—কি হল, সরদাররা বোবা বানিয়ে দিল নাকি!

নিয়ামত চম্‌কে উঠে বললো—হঁ্যা, কি বলছো?

—বলছি তোমার মাথা আর মুণ্ডু। বল্‌ছি—সরদাররা ডেকে নিয়ে গেল কেন?

আসমত স্ত্রীর দিকে ফিরে বললো—ও! তুমি সেই কথা জিজ্ঞেস করছো! সে আর তুমি শুনো না।

—শুনলামই বা, তাতে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি কিছু না, তবে তুমি শুনলে লাফালাফি শুরু করে দেবা।

—না, আমি কিছু করছিনে; তুমি বল।

—সরদার ভাই নিয়ামতের কথা বলছিল।

—কি বলছিল?

—বলছিল, নিয়ামতকে আলাদা করে দেওয়া নাকি আমার ঠিক হয় নি।

—কেন?

—ও ছোট, সংসারে কিছু বোঝে না; হয়তো জমিগুলো নষ্ট করে ফেল্‌বে।

—সেজন্যে সরদারদের মাথা ব্যথা কেন?

—না, সে আমার ভালোর জন্য বলছে।

—ভালোর জন্যে কি বলছেন! আবার একসাথে হতে বলছে নাকি?

—না, তা' নয়। বলছে—ও ছোট, জমি-ক্ষেত সব অর্দ্ধেক ভাগ ওর দিও না। এই বয়সে সম্পত্তির মালিক হলে ঠিক রাখতে পারবে না। তাই জমিগুলো তিনভাগ করে দু'ভাগ আমার রাখতে বলছে আর ওর একভাগ দিতে বলছে। তারপর ও যখন বড় হয়ে সব বুঝতে শিখবে, তখন সমান ভাগ করে দিতে বলছে।

—তা' সরদার তো ঠিক কথাই বলছে। আমি তখন বলিনি! ওর এত সব দিও না। সেদিন যদি আমার কথা শুনতে, তা'হলে আজ কি ওর বৌ

গা-ভরা গয়না নিয়ে বাপের বাড়ী যেতে পারতো! শোননি তো সেদিন, এখন তোমার মানটা বাড়ছে তো খুব! তা' তুমি কি বললে?

—বলিনি কিছু।

—বলতে পারবেও না। তুমি তার সাথে পারবে না, কেননা—পাড়ার মাগী-মিন্‌সে সবায় তার দিকে। তোমার দিক হয়ে হয়তো সরদার দু'টো কথা বলতে পারে, তার জায়গায় এসে না, বাড়ী বসে! যারা সামনে এসে কথা বলতে পারে না, তারা আবার মন্দ মানুষ কিসের! সে-সব মেয়ে মানুষের চেয়েও অধম। এ-সব নিয়ে তুমি নিয়ামতের ঘা' দিয়েছ, তা' থেকে আবার কেড়ে নেবা! তা' তোমার মত অকম্মা মিন্‌সে পারবে না।

আসমত কোন কথা না বলে গরুগুলো ঠুসি মুখে দিয়ে মাঠে নিয়ে গেল। অনেক রকম চিন্তা করে কিছু স্থির করতে না পেরে সে আবার গেল সরদারের কাছে। আসমতকে দেখে বলে—কি হলো, আবার এলে যে! আমার কথা মতে লেগেছে?

—মতে তো লেগেছে, তবে তার যে-সব জমি-ক্ষেত দিয়ে দিয়েছি, তা' আবার নেব কেমন করে! গ্রামের লোক সব তার দিকে কথা বলবে না?

—ও! তুমি সেই ভয় করছো। গ্রামের লোকের ভয়ে তুমি যদি কিছু না কর, তবে তুমি যেদিন বিপদে পড়বে বা ঐ নিয়ামত ছোড়াটা তোমার মান-সম্মান নষ্ট করবে, সেদিন কি গ্রামের লোকেরা তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে না হারানো সম্মান ফিরিয়ে দেবে। সেদিন কেউ এগিয়ে আসবে, এটা মনে কর?

—আমার দখল করে দেবে কে!

—কি দখল? জমি! তা' তুমি হচ্ছো বড় ভাই, ছোট ভাইয়ের জমি নেবা—তা' আবার দখল করা লাগে নাকি! তুমি ইচ্ছামত যেয়ে লাঙ্গল দিলেই তো পার।

—মিয়া সাহেব নিজে ভাগ করে দিয়েছে, তার কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস না করে এ-করা কি ভাল হবে?

—ওরে তোমার মিয়া সাহেব! কি করবে সে? যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়, সে কি করবে তোমার! জানতে পেলে হয়তো দু'এক

কথা বলতে পারে। তা' বললেই বা! তুমি শুনবে কেন তার কথা? তোমার ভাল-মন্দ সে কি করে বুঝবে?

আসমত কোন কথা বললো না। মাথা নীচু করে পায়ের বুড়ী আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুড়তে লাগলো।

সরদার বললো—তা' আমার কথা যদি তোমার মতে লেগে থাকে, আর তুমি যদি দখল করতে না পার, তা'হলে একটা বছর আমার কাছে ভাগে ফসলে দিয়ে দে, আমি দখল করে তোর ফিরিয়ে দেব। আর এক বছর যে আমার কাছে থাকবে, তার ভাগ তুমি পাবা। চিন্তা করে দেখ, যদি আমারে দাও, তবে তাড়াতাড়ি সংবাদটা দিয়ে যেও।

—এবারকার হরিদ খন্দ উঠে গেলে তো তুমি ভাগে নেবা।

—তা' তোমার যখন খুশী, তখন দিও। তবে কথা হচ্ছে কি জানো— শুভ কাজ বিলম্বে বিঘ্ন ঘটে। তাই বলছিলাম—এখন দিতে।

—হরিদ খন্দ উঠে গেলে তখন নিলে ভাল হত না? এখন নিলে কেমন দেখাবে!

—তবে এক কাজ কর, আমন ধানের জমি দে। পৌষ মাসে ধান কেটে নিলে জমিতে জো হলেই আমি লাঙ্গল দেব।

—কোন্ জমিটা নেবা।

—তা' তুমি যদি দাও, তবে উত্তর মাঠের বন্দের ভুঁইটা আমার দাও। কেননা, আমার জমির পাশে আছে, দেখা-শোনা করা সুবিধে হবে। তা'ছাড়া আমার কাছে মাত্র এক বছর থাকছে, তারপর তো তুমি পেয়ে যাচ্ছো।

—আচ্ছা, তাই হল।

—তা'হলে আমায় দিলে তো!

—হ্যাঁ, দিলাম।

—ধান কাটার পর জমির জো' হলে আমি কিন্তু চ'বো, তখন যেন আবার কথার বে-খেলাপ হয় না।

—তা' হবে না।

—একটা কথা শুনে যাও, তোমার দাদার হাতে আমার বাপজান মানুষ হয়েছে। তোমাদের কাছে আমরা চিরদিন ঋণী। তাই বলছি কি—বিপদে-

আপদে আমার আছে এসো, আমি শক্তি অনুযায়ী সাহায্য করবো।

আসমত মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ, আসবো' বলে বাড়ী চলে গেল।

পরিছন জিজ্ঞেস করলো—মনটা যেন বড় হালকা দেখছি। গরু বানতে যেয়ে কিছু পেলে নাকি ?

—তুমি মাঝে মাঝে কি যে বল, আর কি যে হয়—তা' বুঝে উঠতে পারিনে।

এই একটু আগে দেখলাম—ঘাড় গুঁজে কি চিন্তা করছো, আবার মাঠের দিক থেকে ঘুরে এসেই সব চিন্তা উড়ে গেছে—দেখছি, তাই বলছি।

নিয়ামতের উত্তর মাঠের যে জমিটা দেওয়া হয়েছিল, সেই জমিটা আমি নিয়ে নিলাম।

—কি রকম করে নিলে ?

—আমি তো দখল করতে পারবো না, তাই সরদারদের ভাগে দিয়ে এলাম।

—কি বললে! সরদারদের ভাগে দিয়ে এলে! শিয়ালের কাছে ছাগল পোষানী! বলি, এ যুক্তি তোমায় কেডা দিল! তাইতে বুঝি সরদারের ছোট ভাই তোমায় ডেকে নিয়ে গেল। তা' তোমার মাথায় একেবারে গোবর পোরা, একটু ঘেলু বলতে মাথায় নেই!

—কেন, তাই কি হয়েছে ?

—আবার জিজ্ঞেস করছো, কি হয়েছে ? হ'তে তোমার বাকি আছে কি! যারা ফুটো পেলে খুড়ে গর্ত করে, তাদের কাছে তুমি দিয়ে এসেছো ক্ষেতের ভাগ। ছন্নছাড়া মিন্‌সে কোথাকার!

—অমন করে ষাড়ের মত চেঁচিও না। আমি দিয়েছি, বেশ করেছি। তোমার সে চিন্তা কেন!

—দাও, তোমারগুলোও দাও। আমার আর কি! বাপ মা'র চোখ কানা হয়ে গেছে, তাই তোমার ঘরে এসে পড়েছি! আমার হাড়-মাংস তো জ্বালিয়ে খেলে, এবার ছেলে-মেয়েদের খাবা—সে আমি বেশ বুঝতে পারছি।

—বুঝেছো, বেশ করেছো।

—শোন, তোমার ব্যাঘাত করি, তুমি ওদের হাতে ক্ষেত-খামার দিও না। একবার ওদের হাতে পড়লে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। আমি আজ পনের

ষোল বছর এ গ্রামে এসে পাড়ার কেডা কেমন, তা' সব চিনে ফেলেছি। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর, ছোট মিয়া বাড়ী এলে তার কাছে বল—আমার খাওয়ার লোক বেশী, আমার দু'খানা ভুঁই বেশী দিতে হবে। দেখা যাক, সে কি বলে। তুমি যদি তার সাথে বলতে না পার, তা'হলে আমি বলবো।

—তোমাকে আর বলতে হবে না, আমি যা' করবো, তার মধ্যে তোমাদের কারও মাথা গলাতে হবে না।

—বেশ, ভাল কথা। তবে আমিও বলে রাখছি—আমার ছেলেমেয়েদের যেন কোন অসুবিধে না হয়।

পরিছন কথা শেষ করে আপন মনে বকতে বকতে নিজের কাছে চলে গেল। আসমত কলকেয় তামাক আগুন দিয়ে কিছুক্ষণ ধূমপান করে মাঠের দিকে বেরিয়ে গেল গরুর নাড়া দিতে।

সেদিন বিকালবেলা নিয়ামত শ্বশুর বাড়ী থেকে বাড়ী এলো। পরিছন এক পাঁজা জ্বালানী কাঠ রান্নাঘরে আকার পাড়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলো - তার দেবর বাড়ী এসেছে। নিয়ামত ঘরের মধ্যে যেয়ে জামা-কাপড় বদলাচ্ছিল, পরিছন হাতনের ড'র কান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকলো—ছোট মিয়া, বাড়ী এসেছো নাকি?

—হ্যাঁ, ভাবী।

—ছোট বৌ কেমন আছে?

—ছিল তো ভালো, আজ ক'দিন তার শরীর খারাপ যাচ্ছে। ডাক্তারের কাছে অষুধ খাচ্ছে। একটু আরাম হয়েছে দেখে এলাম।

—ওদের বাড়ীর আর সব ভাল আছে তো?

—ভাল।

—ছোট-বৌ কিছু বলে দিল?

—বললো, আবার তাড়াতাড়ি এসে দেখে যেও। আর এবার যাবার সময় বড় খোকাকে সাথে করে নিয়ে যেতে বলেছে।

—খোকার জন্যে সে তো পাগল! আমার পেটের ছেলে, তবু আমি যেন কিছু না ; ও-ই সব! দেখছো না, ছোট-বৌ যাওয়া অবধি ওর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। তা' এবার যাবার সময় নিয়ে যেও। ওর ছোট মার জন্যে পাগল। যাবার দিন দেখলে না—সাথে যাবার জন্যে কেমন কান্নাকাটি করলো। তা' যাক. এখন কিছু খাবা নাকি ?

—না, ক্ষিদে লাগেনি।

—রাত্রে দু'টো খেতে হবে তো ?

—তা' খেলেও হয়।

পরিছন ভাত চড়াতে চলে গেল। নিয়ামত কাপড় বদলিয়ে মাঠের দিকে গেল। উত্তর মাঠের বন্দের জমির ধানটা এক পাঁক দিয়ে দেখে এলো। ধান দেখে তার অন্তরটা খুশীতে ভরে গেল। এ মাঠের সেরা ধান। আল্লাহ তারে এবার ঢেলে দিয়েছে। জমির ধান দেখে বাড়ী আসবার পথে নছর মণ্ডলের সাথে দেখা। নছর মণ্ডল তাকে দেখেই বললো—কি গো, বাবাজী! ধান-পাট ভাল হয়েছে বলে আর দেখাটি পর্যন্ত যায় না ; ব্যাপার কি!

—দেখা যাবে না কেন, আমি কি পালিয়ে বেড়াচ্ছি নাকি ?

—দু'দিন দেখা হয়নি, তাই বলছি।

—ও! এ-দু'দিন বাড়ী ছিলাম না।

—শাশুড়ীকে দেখতে গিয়েছিলে বুঝি ?

—হ্যাঁ গো।

—সব ভাল তো ?

—ভাল।

—কখন এলে ?

—এই যে কিছুক্ষণ আগে এসেছি।

—এদিক কোথায় গেলে ?

—বন্দের ভুঁইর ধান দেখতে গেলাম।

—তা' সত্যি, দেখার মত ধান তোমার হয়েছে। ভুঁইর আইলে যেয়ে দাঁড়ালে চোখ জুড়িয়ে যায়, ক্ষিদে লাগে না। দেখেই যেন পেট ভরে যায়। আল্লাহ তোমার কপাল খুলে দিয়েছে। দেখ, তোমার ভুঁইর পাশে

সরদারদের ভুঁই রয়েছে, কিসমতের ভুঁই রয়েছে ও-পাড়ার জিরাবাদ্দির ভুই রয়েছে ; কই, কারও ভুঁইতে তো এমন ধান হয়নি। এ-সব কপাল—বাবা কপাল! অন্তর যার ভাল, তার সবই ভাল। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে এক সাথে কাজ করছি পাঁচ ছ'জন মিলে। দেখলাম তো কে কেমন লোক। দেখ, মিয়া সাহেব নিজ খরচে একজন হাফেজ সাহেবকে রেখেছেন ; গ্রামের লোক তার কাছে দোয়া-দরুদ রোজা-নামাজ শিখবে বলে। ক'জন লোক যায় তার কাছে। ও-পাড়ার মধ্যে কেবল তুমি আর মাঝ-পাড়া আর উত্তর পাড়ার থেকে গোটা চারেক। তবে তোমার মত অন্তর দিয়ে ক'জন শিখছে। মিয়া সাহেব গ্রামের লোকের ভালর জন্যে চেষ্টা করছে। শুধু কি গ্রাম! দেশের জন্যে তার রাত দিন ঘুম হয় না, কবে দেশ স্বাধীন হবে—সেই আশা নিয়ে দিনরাত ঘুরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে। এমন মানুষ আর হয় না বাবা। ওর বাপজানও ছিলেন ভাল মানুষ। তা' গ্রামের মানুষ বলতে তো ওরা। গ্রামে এতো মানুষ বাস করে, তা' ক'জন লোকে চিনেছে ওদের! ওর বাপজান বেঁচে থাকতে গ্রামটা এক হাতে রেখে বেশ করে গড়ে তুলছিলেন। তিনি মরে যাবার সময় নাবালক ছেলে রেখে গেলেন। কে শোনে তার কথা! তাঁর ছেলে সাবালক হ'ল। আর দেখ, বাপের মত গ্রামের লোকের জন্য পাগল হয়ে উঠলো। দেখ, গ্রামে স্কুল চলছে, তা'ছাড়া বাড়ীতে একজন হাফেজ রাখলো—গ্রামের ছেলেমেয়ে মানুষ হবে, যোয়ান-বুদ্ধেরা নামাজ-রোজা শিখবে। মিয়া সাহেব তো এক যায়গায় থাকবার লোক নয়। সে মনে করছে গ্রামের লোক মিলেমিশে বাস করছে। এদিকে কিন্তু সরদার গ্রামের লোকগুলো অধঃপতনে নামিয়েছে। সে একলা কোনদিক সামলাবে। যে দিন-কাল যাচ্ছে, তা' ঘরে পড়ে থাকলে ও-সব লোকের ঘুম হয় না। তা' বাবা যে যা করে করুকগে, গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাকগে! তোমার জন্যি আমি কাঁদি, তুমি যদি তা' বুঝতে না পার, তবে আমার কাঁদবার কি দরকার। আমরা বাপু বুড়ো হয়ে গেছি, আর ক'দিনই বা বাঁচবো। আমাদের দিন ফুরিয়েছে, তোমরা বাবা দিন থাকতে পথে উঠো। এই দেখ—যেভাবে সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে, তা' দু'এক বছরের মধ্যেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। তোমরা নতুন দেশের নতুন নাগরিক হবে। তোমাদের কি আনন্দ হবে।

তখন তোমাদের ভাবধারা আচার-ব্যবহার সব পালটাতে হবে। তাই মিয়া সাহেবদের মত লোকদের রাতদিন ঘুম নেই— কি করে দেশ ও দশ গড়ে তুলতে হবে, সেই চেষ্টায় মস্ত। যারা জাগবে, তারা সেই নতুন দেশকে সম্বর্ধনা জানিয়ে তার খেদমত করতে এগিয়ে যাবে। আর যারা জাগবে না, তাদের মত হতভাগাদের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।

নিয়ামত জানে, এ লোকটার অন্তর ভাল। আর কোন রকম অন্যায় অত্যাচার পছন্দ করে না। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করলে তাড়াতাড়ি থামতে চায় না। অবশ্য লোকটা ভালোর জন্যে বকে। বকলে কি হবে, কে শোনে তার কথা! নিয়ামত একটু শোনে, তাই সে এখনও ভাল পথে চলে। সে বল্‌লো—তা' চাচা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ কথা বলবা, চল বাড়ীর দিকে যাই। সন্ধ্যে হলে গেল; বাড়ী যেয়ে আবার আলো ধরাতে হবে তো!

॥ ২১ ॥

নিয়ামত তার ভাইপোকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী গেল, তার এক ছেলে হয়েছে তাই দেখতে। হয়েছে প্রায় কুড়ি বাইশ দিন হয়ে গেল, কিন্তু সময় মত সে যেতে পারেনি। কেননা, আমন ধান গুছিয়ে না রেখে তো যাওয়া যায় না। যে কয় বিঘে ধান ছিল, সব কেটে বিঁচালী ঝেড়ে আঁটি মলে শুকিয়ে গোলায় তুলে রেখে তাই ছেলে দেখতে গেল। যাবার সময় পরিছন বলে দিল—বৌ যখন বাপের বাড়ী গেল, তখন তো গা-ভরা গয়না তৈরী করে দিলে। এবার ছেলে হয়েছে—যেন শুধু হাতে যেয়ে কোলে নিও না। ভাগ্য বলতে হয় তোমার! এ-বছর সবার চেয়ে তোমার ধান ভাল হয়েছে, তারপর আবার সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে; এমন কপাল ক'জনের হয়ে থাকে! নিয়ামত ছেলের জন্যে একটা জামা আর একটা প্যাণ্ট তৈরী করে নিয়ে গেল। সন্ধ্যের কিছু আগে সে যখন শ্বশুর বাড়ীতে পোঁছল, তখন সখিনা তার ছেলেকে কোলে নিয়ে উঠোনে বেড়াচ্ছিল। স্বামীকে দেখে তার যেন একটু লজ্জা লাগলো! ছেলেটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে একদৌঁড়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। নেয়ামত হাতনেয় যেয়ে উঠতেই তার শালার বৌ "কি খবর! এতদিন পালিয়েছিলে কেন! আসতে ভয় করছিল নাকি!"—বলে ছেলেটা সখিনার কোল থেকে নিয়ে এসে তার কোলে দিল। নিয়ামত লজ্জায় কথা বল্‌তে পারলো না! হাজার হোক, পয়লা সন্তানের বাপ হয়েছে তো! লজ্জা একটু করবে বৈ কি!

শালা-বৌ তার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো—কি হল, কথা বলছো না কেন! ছেলের বাপ হয়েছো, তা' আবার লজ্জা কিসের! এমন করে ঘাড় গুঁজে বসে থাকলে চলবে না, আমাদের জন্যে কি এনেছো—তাই দাও দেখি।

সখিনা ততক্ষণে লজ্জা সামলিয়ে নিয়ে হাতনেয় তার স্বামীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বললো—ও ভাবী, তুমি তো আচ্ছা মানুষ দেখছি! এখন এলো, একটু বসতে না বসতেই জ্বালাতন আরম্ভ করে দিলে!

—দেখছো, বু' কেমন মানুষ! ওনার মানুষের কাছে মিষ্টি খেতে চাচ্ছি, আর উনি অমনে দৌড়ে এসে ধমক দিচ্ছে! তা' তোমার মানুষটা তো আর খেয়ে ফেলছিনে! ছেলের বাপ হয়েছে, তা' আমাদের একটু মিষ্টি-মুখ করাবে তো!

নিয়ামত বাড়ী থেকে যে কাপড়ের টোপলাটা নিয়ে গেছিল, সেটা তার বগলের তলে ছিল। সে স্ত্রীকে ইশারা করতেই সখিনা বগলের তল থেকে টোপলাটা নিয়ে খুলে ফেললো। তার মধ্যে নিয়ামতের একখানা লুঙ্গি, ভাই-পো-র জামা-প্যাণ্ট, ছেলের জামা-প্যাণ্ট আর এক ঠোঙা মিষ্টি ছিল। সখিনা মিষ্টির ঠোঙাটা তার ভাবীর হাতে দিয়ে বললো—এত মিষ্টি খাবার সাধ হয়েছে তোমার, তা'—এই নাও।

সখিনার ভাবী ছেলের জামা-প্যাণ্ট দেখে—"ওমা একি! দেখি পরিয়ে দেই" বলে হাতে তুলে নিল।

নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে তার শাশুড়ীর কাছে নিয়ে যেয়ে বললো—এই দেখ মা, তোমার জামাই ছেলের জন্যে কি নিয়ে এসেছে! খোকার নানী কি করছিল, পিছন ফিরে তাকিয়েই বললো—ওমা একি! সরে এসে খোকার গায়ের জামা টান্‌তে টান্‌তে বললো -ওরে, আমার বাপ আমার জন্যে জামা-কাপড় নিয়ে এসেছে! তা' তুই পরলি কেন! দে, খুলে দে! বুড়ী তার নাত-ছেলেকে নিয়ে বেশ রসিকতা করতে লাগলো। ও-দিকে সখিনা তার স্বামীর কাছে বাড়ীর কুশল জিজ্ঞেস করলো! ধান কেমন হয়েছে, সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে এসেছে কি-না—সব জেনে নিল।

নিয়ামত দেখলো—তার এখানে আসতে এত দেরী হয়েছে, তার জন্যে সখিনা একটুও রাগ করেনি বরং বাড়ীতে যে ধান কেটে-ঝেড়ে গুছিয়ে রেখে এসেছে, তা' শুনে খুব খুশী হ'ল। আর তার ভাবী ছেলে হওয়া অবধি যে মিষ্টি খাবে বলে তাকে বার বার নাজেহাল করে আসছে, সেই কথা মনে করে বললো—তুমি যে আসবার সময় মনে করে মিষ্টি এনেছো, তার জন্যে আমি সত্যি খুশী হয়েছি। তুমি যদি মিষ্টি না আনতে, তা'হলে ভাবীর জন্য এতোক্ষণ এখানে টিকা দায় হয়ে যেত! সখিনা তার স্বামীকে এক বদনা পানি দিয়ে বললো—নাও, হাত-পা ধুয়ে বস। সখিনা তার ভাসুর'পো-র পা ধুইয়ে

কোলে করে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল। তার মা কেমন আছে, আসবার সময় কিছু বলে দিয়েছে কি-না—সব কিছু জেনে নিল। সখিনা তার এই ভাসুর-পো-কে খুব ভালবাসে। বাড়ীতে থাকতে দিন-রাতের অধিক সময় সে তার কাছে থাকতো! বাপের বাড়ী আজ ক'মাস এসেছে, এর মধ্যে কতদিন যে তার খোঁজ নিয়েছে—তা' অনেকে নিজের ছেলের খোঁজও এমন করে নেয় না।

দু'দিন শ্বশুর বাড়ী কাটিয়ে নিয়ামত বাড়ী এলো। সেদিন সন্ধ্যেবেলা মিয়া সাহেব তাকে ডেকে পাঠালেন। অনেকদিন মিয়া সাহেবের সাথে তার দেখা হয়নি। কেননা, তিনি তো বাড়ী থাকেন না। এখানে-ওখানে সভা-সমিতি করে ঘুরে বেড়ান। মাঝে মাঝে বাড়ী আসেন, তাও দু'একদিন থেকেই আবার চলে যান। আগে লোকে তাকে 'তুমি' বলে ডাকতো। এখন গ্রামের লোকেরাও 'আপনি' বলে ডাকে। কেননা, তিনি অনেক ভদ্রলোকের সাথে ঘুরে বেড়ান, তাঁরাও তাঁকে সম্মান করেন। মাঝে মাঝে তাদের জীপ্-গাড়ীতে করে বাড়ী আসেন, তাই গ্রামের লোক মনে-প্রাণে সম্মান না করুক, অন্ততঃ ভয়ে তাঁকে সম্মান করে। কেননা, তখনকার দিনে জীপ্-গাড়ী খুব একটা দেখা যেত না। যারা জীপে চড়তেন, তাঁদের দেখলে তখনকার লোক খুব ভয় পেত। তাই মিয়া সাহেবকে এখন সবায় 'আপনি' 'আপনি' বলে ব্যবহার করে। তবে সরদাররা তাকে মনে-প্রাণে ঘৃনা করে। তার কারণ, তারা চায় – গ্রামের সবায় তাকে সম্মান করুক, আর সে-ই সবার উপরে মাতুব্বরী করে বেড়াক।

কিছুদিন আগে গুজব উঠলো—স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য মিয়া সাহেবকে অন্যান্য লোকের সাথে ধরে জেলখানায় পুরেছে। তাই শুনে সরদারদের সে কি লাফালাফি! সরদার গ্রামের লোকের বলতো—তোমরা-তো সব মিয়া সাহেবের নামে পাগল! এবার দেখলে তো তার অবস্থাখানা! একেবারে ছোট নজর! তার বাপ এতো রেখে গেছে, তাতেও তার পেট ভরছে না; ক'নে নাকি ডাকাতি করতে যেয়ে ধরা পড়েছে। সেদিন শুনলাম—ধরে কত মার মেরেছে তারে। এখন নাকি জেলখানার মধ্যে পঁচে মরছে। তোমরা আমাদের খারাপ লোক বলে বাদ দিয়ে রেখেছো, এবার দেখ—খারাপ

লোক কেডা! আমি বলিনি? ওরে আসমত! ওর মাথা-খারাপ হয়ে গেছে, এখন তো কিছু বুঝবে না, বুঝবে একদিন! ঐ নিয়ামত ছোড়াটার মাথাটা ঐ মিয়া সাহেবই খেয়েছে। নইলে ও-কি নিজের মায়ের পেটের বড় ভাই থাকতে তার কাছে যুক্তি না নিয়ে মিয়া সাহেবের কাছে যায় যুক্তি নিতে! এ ভাল মানুষ, ও ভাল মানুষ—এখন দেখলেতো কে ভাল মানুষ! অনেকদিন সরদারের ঘুম হয়নি। সময় মত খায়নি, একবার এ-পাড়ায় আবার ও-পাড়ায়। এক কথা, দু'কথা বলে মিয়া সাহেবের কথা। অবশ্য তার কথা কেউ বিশ্বাস করতো না। কেননা, তাঁর বাপ অগাধ সম্পত্তি রেখে গেছেন। টাকা-পয়সার তাঁর কোন অভাব নেই, কি দুঃখে ডাকাতি করতে যাবে মিয়া সাহেব! তবু সরদার কি ছাড়বার পাত্র! ইনিয়ে বিনিয়ে কত কি বলে তাদের বিশ্বাস জন্মিয়ে দিত। সে তারিখে মিয়া সাহেব অনেকদিন বাড়ীতে আসেননি।

সরদার বাড়ী বাড়ী যেত আর বলতো—তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর না, এবারে দেখলেতো—আজ কতদিন হয়ে গেল, তবু মিয়া সাহেব বাড়ী এলো না। আর বাড়ী আসবে কি করে! ডাকাতি করেছে, তার শাস্তি ভোগ করে তারপর বাড়ী আসবে তো! সে অনেক দেরী। যারা মিয়া সাহেবকে সত্যি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো, তাদের মনের মধ্যেও দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিল। সত্যি কি মিয়া সাহেব ডাকাতি করতে যেয়ে ধরা পড়েছে! তারা কথাটা মেনে নিলেও মনে-প্রাণে সত্যি বলে গ্রহণ করতে পারেনি। তবে গ্রামের বেশীর ভাগ লোক বিশ্বাস করেছিল - নিশ্চয় মিয়া সাহেব বিপদে পড়ে গেছে, তাই বাড়ী আসতে পারছে না।

তারপর সেদিন সন্ধ্যের পর যখন একখানা জীপ,গাড়ী মিয়া সাহেবের বাড়ী এলো, তখন গাড়ীর শব্দ শুনে সরদার খোদার কাছে জানিয়েছে— ধারণা যেন সত্যি হয় নইলে গ্রামের কারও কাছে এ পোড়া মুখ আর দেখাতে পারবো না। সরদার মনে করছিল—নিশ্চয় ধরা পড়েছে, তাই বোধ হয় উপর থেকে খোঁজ নিতে এসেছে। এ-অঞ্চলে এবং এ-গ্রামে এই প্রথম জীপ্ গাড়ী আসতে দেখে—তাও আবার মিয়া সাহেবের বাড়ীতে, অনেকে মনে করেছিল—নিশ্চয় তাঁর কোন অমঙ্গল হয়েছে। সবার আগে বুড়ো সরদার হাঁফাতে হাঁফাতে, দৌড়াতে দৌড়াতে গুতো-গাতা লেগে কয়েকবার আছাড়

খেয়ে মিয়া সাহেবের খামারে এলো। গাড়ীর ভিতর থেকে যখন মিয়া সাহেবকে নামতে দেখলো, তখন তার পিলে চমকে উঠলো। সেখানে আর একটুও দাঁড়ালো না। যে পায়ে এসেছিল, সেই পায়েই পিছে ফিরে হন্ হন্ করে বাড়ীর দিকে চলে গেল। সেই যে সরদার বাড়ী যেয়ে বিছানায় পড়লো, তা' পনের দিনের কমে বাইরে বেরুলো না।

নিয়ামত যেয়ে বৈঠকখানায় উঠতেই মিয়া সাহেব বললেন—কিরে নিয়ামত! ছিলি কোথায়! আজ দু'দিন বাড়ী এসেছি, তা' তোর খোঁজ-খবর নেই। শ্বশুর-বাড়ী গেছিলি নাকি?

—হ্যাঁ!

নিয়ামত আগে মিয়া সাহেবকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতো, আজ যেন সেইভাবে সম্বোধন করতে তার বিবেকে বাঁধলো। সে বললো—আপনিই-বা এতোদিন কোথায় ছিলেন?

—ওরে, আমার কি থাকবার যায়গার অভাব আছে রে! কত যায়গায় সভা-সমিতি করে বেড়ালাম। দুঃখ হয়—একবার নিজের গ্রামের লোক-গুলোকে দু'কথা বলে পথে ফিরিয়ে নিতে পারলাম না। তা' আমাদের বকাবকি বিফলে যাবে নারে! দেখিস্, আমরা খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীন হব। তোরা একেবারে গো-মূর্খ হয়ে থাকলি; যে দেশটায় আমরা বাস করছি, সেই দেশটাকে নিজের দেশ বলে দাবী করতে শিখলিনে! আমরা যে রাতদিন খাটছি, তা' কি ভুতের ব্যাগার দিচ্ছি নাকি! নিশ্চয় দেখিস, আমরা খুব শীঘ্র স্বাধীন হচ্ছি। তা' তোরা সেই নব স্বাধীন দেশকে কি দিয়ে সম্বর্ধনা জানাবি! এ-দেশের কত লোককে মন্ত্র দিয়ে বশীভূত করে ফেলেছি—পারলাম না কেবল তোদের। তাই এবার অনেক চেষ্টা করে বাড়ী এলাম, সামনের শনিবারে একটা জনসভা করবো আমাদের স্কুলের সামনে। 'হাণ্ডবিল' ছাপিয়ে এনেছি। বাজার-ঘাটে ছড়িয়ে দিয়েছি। তোরা একটু নেক নজর দিস, তা'হলে আমি গ্রামের লোকের যাতে উন্নতি হয়, তাই চেষ্টা করবো।

শনিবার বিকেল তিনটের সময় স্থানীয় স্কুলের সামনে বহু লোক এসে উপস্থিত হ'ল। তারা দেশের জন্যে কি করতে পারে, তাদের দায়িত্ব কি, পরাধীনতার শৃঙ্খল কিভাবে ভেঙ্গে ফেলতে হবে—সে সম্বন্ধে তাদের বুঝিয়ে

দেওয়ার জন্যেই এই জন-সভার আয়োজন। মিয়া সাহেব এবং এক বন্ধু আগেই উপস্থিত ছিলেন। তারা বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলেন। সাড়ে তিনটের সময় জীপে করে আরও চারজন ভদ্রলোক এলেন। যারা প্রকৃতই সভায় কি আলোচনা হয়, তা শুনবার জন্যে এসেছিল, তারা সত্যি খুব খুশী হ'ল। এবং মিয়া সাহেবের প্রতিবেশী করে ভক্তি এসে গেল। গ্রামের প্রায় সব লোকই বুঝলো—মিয়া সাহেবের সম্বন্ধে সরদার যে-সব কথা বলতো, সব মিথ্যে। এতো ছোট নজর তাঁর নয়; বরং তিনি যে-সব ভদ্রলোকদের সাথে বেড়ান, তাদের সাথে সরদারদের চৌদ্দ পুরুষের কেউ বেড়াতে পারবে না। তাদের হিংসা হয়, তাই এমনভাবে কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়। উপস্থিত জন-মণ্ডলীর মধ্যে যারা রসিকতা করতে এসেছিল, তারা ভয় পেয়ে গেল। তারা মনে করেছিল—মিয়া সাহেব বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলে তারা হৈ চৈ করে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দেবে। তারা হচ্ছে সরদারের দলের লোক। তারা এসেছিলও বেশ জাকজমক করে। তারপর যখন জীপে চড়ে দামী পোষাক পরিহিত চারজন ভদ্রলোক এলেন এবং মিয়া সাহেব এগিয়ে যেয়ে তাদের হাতে হাত মিলালেন, তখন বিপক্ষদের সব ছল-চাতুরী ভেস্তে গেল! মিয়া সাহেবকে যে কোন প্রকারে নীচে ফেলে তারা উপরে উঠবে এবং গ্রামের লোকগুলোকে হাত করে নেবে—এমন একটা পথ অনেক দিন থেকে সরদাররা খুঁজছিল। তিনি গতবারে যখন অনেকদিন বাড়ীতে এলেন না, তখন মিথ্যে বদনাম রটিয়ে জেল হয়েছে বলে অনেক লোককে দল ভাঙ্গিয়েছিল। তার পর তিনি যখন বাড়ী এলেন, তখন তারা দিনের বেলা খুব একটা বাইরে বেরুতো না। মাঠে মাঠে কাজ করতো আর ঘরে এসে শুয়ে থাকতো। কদাচিৎ যাদের সাথে দেখা হয়ে যেত, তারা বলতো—কি হল, সরদার ভাই! মিয়া সাহেব নাকি জেলে পঁচে মরছে! ছিঃ! ছিঃ! এমন মিথ্যে কথা তুমি বলতে পার! তোমার চৌদ্দ-পুরুষের কেউ পেরেছে জীপ গাড়ীতে চড়তে! লজ্জাও করে না! সরদার এমন তিরস্কার কত শুনলো, কিন্তু কারও সাথে একটি কথাও বলেনি।

মিয়া সাহেবের বিরুদ্ধে গোলমাল বাঁধাতে আজকে তার শেষ চেষ্টা ছিল। শেষ পর্যন্ত তারা মনে করলো, মিয়া সাহেব যে-সে লোক নয়! ভাল ভাল লোকের সাথে তার চলা-ফেরা। তার এক কথায় আজ এত লোক এখানে

জন্য হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গোলমাল করলে পিঠ বাঁচবে না। আর কোন দিনই যে মিয়া সাহেবকে প্যাচে ফেলা যাবে, সে আশা তারা একেবারেই ছেড়ে দিল। মিয়া সাহেব অবশ্য তাদের প্রতি কোনদিন রাগ করেননি বা তাদের কোন গাল-মন্দ দেননি! এ-তারিখে তার স্ত্রীতে বাড়ী আসবার দরুণ সরদার তার নামে অনেক কুৎসা রটিয়েছে গ্রামের সবার কাছে। এ-কথা নিয়ামতের কাছে শুনে তিনি অন্তরে খুব আঘাত পেলেন। দেশ ও দশের ভালোর জন্যে তারা সংগ্রাম করে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা তা বুঝছে না। এমন একটা সংকাজে অংশ গ্রহণ করবে না—আবার কাওকে এ-পথে এগিয়ে আসতে দেবে না। এমন লোকগুলোকে আর ক্ষমা করলে শেষ রক্ষা করা যাবে না। আলিবর্দী খাঁ ঘসেটি বেগমের না দিয়ে সিরাজকে রাজা দেওয়ার জন্য হিংসা-হিংসী করেই আমাদের এই দুর্গতি। সিরাজ যদি তখন বুঝতে পারতো যে, তার খালা-ই হবে তার জীবনের মৃত্যুবাণ, আর এ-কথা বুঝে যদি তাকে শেষ করে দিত, তা'হলে আজ আমাদের দেশের জন্য বিদেশীর সাথে সংগ্রাম করতে হত না। আজ আমরা বুঝতে পেরেও যদি ঘসেটি বেগম আর মীরজাফরের মত লোকগুলোকে ক্ষমা করে যাই, তা'হলে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। মিয়া সাহেব মনে প্রাণে এবার থেকে সরদারদের ঘৃণা করতে শুরু করলেন। সেদিন জন-সভায় এমন ধরণের লোকগুলোকে হুশিয়ারী করে দিলেন যে, তারা যদি এমনভাবে শত্রুতা করে দেশের ভাল লোক-গুলোকে কাজে এগিয়ে যেতে না দেয়, তা'হলে তাদের কোনদিন ক্ষমা করা হবে না। স্বাধীন অবশ্য আমরা খুব শীঘ্র হচ্ছি, সেদিন এই সমস্ত সমাজের দুশমন জাতির কলঙ্ক স্বরূপ লোকগুলোকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে শেষ করা হবে। মিয়া সাহেবের এ-কথার শেষে তার বন্ধুরা হাতভালি দিয়ে তাকে সমর্থন জানিয়ে-ছিলেন। সেদিন সত্যি সত্যি সরদারদের মনে একটা আতঙ্ক এসে গিয়েছিল।

সেদিন রাতে মিয়া সাহেব লোক পাঠিয়ে বুড়ো সরদারকে ডেকে এনে তার ভদ্র বন্ধুদের সামনে খুব করে তিরস্কার করলেন। সরদার অপমানিত হয়ে বাইরে নেমে এলো। তার দু'চোখ হিংসায় জ্বলে উঠলো। নিয়ামতের প্রতি তখন তার ক্রোধ পড়লো। কেননা, মিয়া সাহেব নিয়ামতের কাছেই সরদারদের মিথ্যা রটনার কথা শুনেছিলেন। সরদার মনে মনে স্থির করলো—

মিয়া সাহেবকে সে কিছু না করতে পারুক, অন্ততঃ নিয়ামতকে সে পথের ফকির বানিয়ে ছাড়বে। গ্রামের সবার কাছে বলেছিলাম, মিয়া সাহেব ডাকাতি করে জেলে পঁচে মরছে, কিন্তু কেউ তো তার সাথে বলেনি; নিয়ামত বলতে গেল কেন! তার এতো মাথা ব্যথা করছিল কেন! সে যদি না বলতো. তা'হলে এতো ভদ্রলোকের সামনে গ্রামের এতো লোকের সামনে এমন করে অপমান করতে পারতো! আজ বাদে কাল মিয়া সাহেব চলে যাবে, দেখি বাছাধন কে তোর সাহায্য করে। সরদার ঘরের হাতনেয় বসে বসে সে রাতটা কেবল কলকের পর কলকে তামাক পুড়িয়েছে আর কু-চিন্তা করে কাটিয়েছে।

সেদিন সরদারের ভাইঝি-জামাই কেচমতও তাদের বাড়ীতে ছিল। চাচা-শ্বশুরের অপমান তারও মনে আঘাত হানলো। সে-ও সে রাত শ্বশুরের সাথে বসে পরামর্শ করেছে—কি করলে নিয়ামতকে পথে নামানো যায়। অবশ্য অনেক রকম অসৎ কাজ তার জানা আছে।

॥ ২২ ॥

যেদিন দেশ স্বাধীন হল, সেদিন দেশ-জোড়া সে কি আমোদ-আহ্লাদ! মিয়া সাহেব সাত গ্রামের লোককে দাওয়াত করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে স্বাধীনতা-উৎসব পালন করলেন। এই উৎসবে তিনি অনেক টাকা খরচ করলেন। সাত গাঁওয়ের মানুষ পেটপুরে খেয়ে আমোদ করতে করতে মিয়া সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনা করতে করতে বাড়ী গেল। নিয়ামত সেদিন সকাল থেকে মিয়া সাহেবের বাড়ী কাজে ব্যস্ত ছিল। তার স্ত্রী সখিনাও তাঁদের বাড়ীতে ভাল পাক করতে গেল। তারা যখন বাড়ী এলো, তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সখিনা ছেলে কোলে করে ঘরের হাতনেয় উঠেই হাউ-মাউ করে চীৎকার করে উঠলো। নিয়ামত বাহির থেকে দৌঁড়ে এলো।

—কি হল, অমন করছো কেন?

—ঘরের দোর আগলা কেন!

—দোর আগলা থাকবে কেন, আমি যে তালা দিয়ে রেখে গেলাম।

—এই দেখ, দোর আগলা।

নিয়ামত আলো জ্বেলে ঘরের মধ্যে যেয়ে দেখে সব চোরে নিয়ে গেছে; ঘর একেবারে পরিষ্কার। ঘরে কিছু নেই, শোবার বিছেন পর্যন্ত নেই। তক্তপোষের দিরাজের মধ্যে তার অনেক টাকা পয়সা ছিল, সেই দিরাজও ভেঙ্গে ফেলে টাকা পয়সা সব নিয়ে গেছে। নিয়ামত আছাড় খেয়ে পড়লো ঘরের মেঝেই। স্বামী-স্ত্রীর চীৎকার শুনে আসমত, পরিছন ছুটে এলো; পাড়ার আরও অনেক মেয়ে পুরুষ দৌঁড়ে এলো। তারা এসে ঘর পরিষ্কার দেখে খুব দুঃখ করতে লাগলো। ময়নার মাও এলো। ঘর খালি দেখে বাইরে বেরিয়ে আসতেই গোলার দোরও যে খোলা, তা-ও তার নজরে পড়লো। আলো নিয়ে দোরে উঁকি মেরে দেখলো—একটা ধানও নেই। নীচে মাটিতে অনেক ধান ছড়িয়ে রয়েছে। ময়নার মা আর চুপ করে থাকতে পারলো না। এলো-পাথারি বকতে শুরু করলো—পোড়ামুখো আটকুড়োর দল, তাদের চৌদ্দ পুরুষের

মুখে আগুন। হাড়-হাভাতে লক্ষ্মীছাড়ার দল—কাজ করে খেতে গতরে ব্যথা লাগে, পরের ঘর মেরে খেতে বড় মজা লাগে! চোরের ব্যাটা চোর! তোদের ঘরে আগুন লাগুক, তোদের বৌ-ছেলেমেয়ে ওলাউঠায় মরুক। আহা! বাবা আমার কত কষ্ট সহ্য করে এতো ধান, টাকা বানালো আর গতর শোকার দল সব নিয়ে গেল! তাদের বংশ শুদ্ধ ওলাউঠায় মরুক। হারামজাদারা কেউ আসেনি, সব লুকোচ্ছে। দাঁড়া, তোদের লুকোনো ভাল করে দিচ্ছি।

ময়নার মা বকা বন্ধ করে জোরে পা চালিয়ে সরদারদের বাড়ী গেল। চুপি চুপি গোলার পাশ দিয়ে গোয়াল ঘরের পিছন দিয়ে রান্নাঘরের পিছনে যেয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা শুনতে পেল। পিছন ঘুরে পূবের পাশে যেয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো জুড়ন আর কেসমত গর্ত বুজোচ্ছে, আর বুড়ো সরদার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ময়নার মা সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না, ছুটে গেল মিয়া সাহেবের কাছে। মিয়া সাহেব ততোক্ষণে গোলমাল শুনে নিয়ামতের বাড়ীতে চলে এসেছে, কি হয়েছে তাই দেখতে। ময়নার মা তাঁকে আড়ালে ডেকে বললো—তুমি তো বাবা আজকাল বাড়ী থাকো না, তা' গ্রামের হাবভাব কিছু জানো না। এই দেখ—আজকে নিয়ামতের সব নিয়ে গেছে। শুধু গোয়ালে গরু দু'টো যা' রয়েছে। রাত পোহালে কি খাবে—তা-ও ওর ঘরে নেই। খাওয়া তো পড়ে থাক, কি পরবে—কিসে শোবে, তা-ও নেই। কে এ কাজ করেছে, তা' কি আমরা জানিনে বাবা!

মিয়া সাহেব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন—কে চুরি করেছে, তা' আপনি জানেন চাচী, মা?

—জানতাম না কিছু, এখন সব জেনে ফেলেছি।

—কে নিয়েছে?

—সরদাররা।

—আপনি কি করে জানলেন?

—সন্দেহ করে চুপি চুপি যেয়ে দেখে এলাম, সব রান্না ঘরের মেঝেয় পুতে রাখছে।

মিয়া সাহেব বললেন—আপনি বাড়ী যান চাচী-মা, ভোর হয়ে গেছে। আপনি কারও সাথে এ-কথা বলবেন না, আমি এর ব্যবস্থা করবো।

মিয়া সাহেব ফজরের নামাজ পড়ে নিয়ামতকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেলেন। বড় বাবুর সাথে আগেই তাঁর হৃদ্যতা ছিল। দারোগা সাহেব এত ভোরে মিয়া সাহেবকে থানায় দেখে একটু আশ্চর্যবোধ করলেন। তিনি তাঁকে সম্মান করতেন আগে থেকেই। তাঁর হাতের কাজ ফেলে রেখে 'ব্যাপার কি' বলে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। মিয়া সাহেব কেস লেখালেন। তখনই 'ইন্‌কোয়ারী' করতে বড়বাবু নিজেই সেপাই সহ তাঁদের সাথে গেলেন।

নিয়ামতের বাড়ী এসে বসলেন। ঘর গোলা দেখলেন। সিপাই পাঠালেন—সরদারদের দু'ভাই এবং ও-পাড়ার কেচমত এবং তার দু'টো চাচাতো ভাইকে ডাকতে। গ্রামের চৌকিদার সিপাইদের সাথে করে নিয়ে সরদার বাড়ী গেলেন। নিয়ামতের বাড়ী দারোগা এসেছে শুনে বুড়ো সরদার আগেই কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিল। চৌকিদার বাইরে থেকে বারকয়েক ডাকলে তার ছেলে আকবর এসে বললো—বাপের খুব জ্বর।

—বড় বাব ডাকছে, শুনে যেতে বল।

আকবর বাড়ীর মধ্যে থেকে ঘুরে এসে বললো—বাপের সারা-গায়ে ব্যথা, উঠে আস্‌তে পারবে না।

—তোমার চাচা কোথায়?

—বাড়ী নেই?

—কোথায় গেছে?

—বলতে পারিনে।

সিপাইদের সন্দেহ হল। তারা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। তাদেরকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেখে জুড়ন গোয়াল-ঘরের মধ্যে পালাচ্ছিল। একজন সিপাইয়ের নজরে পড়ে গেল। সিপাই গোয়াল-ঘরে ঢুকে রুলের ঘা লাগিয়ে কান ধরে বাইরে নিয়ে এলো। জুড়ন 'ওরে বাবারে, গিছিরে-মলাম রে' বলে চীৎকার শুরু করে দিল। সিপাই তার পিঠে আরও দু'ঘা বসিয়ে দিয়ে বললো—বেশতো পলাতে শিখেছিস, দেখ্‌ছি! তোর ভাই কই?

—ভাইয়ার জ্বর।

—আরে তোর জ্বর! বেরিয়ে আসতে বল, নইলে কান ধরে টেনে আন্‌বো ঘর থেকে।

বুড়ো সরদার সিপাইয়ের কথা শুনে আস্তে আস্তে কাঁথা সরিয়ে যেন সারা গায়ে ভীষণ ব্যথা, এমন ভাব দেখিয়ে ঘর থেকে বাইরে নেমে এলো।

—কি বলছেন আপনারা?

—বলছি তোমার মাথা-মুণ্ডু। চল, বড়-বাবু ডাকছেন।

—কোথায়?

—ঐ যে, ঐ-বাড়ী।

—অতোদুর আমি যে হেঁটে যেতে পারবো না, বাবা!

—কেন?

—আমার সারা গায়ে ব্যথা। এতো পথ হাঁটতে পারব না।

—চুরি করবার সময় গায়ে ব্যথা হয়নি, এখন বুঝি গায়ে ব্যথা হয়েছে, ও-সব ধোকাবাজি বাদ দিয়ে ভালোয় ভালোয় চল, নইলে গলা ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাব।

সিপাইরা তাদের দু'ভাইকে নিয়ে বড় বাবুর সামনে হাজির করালো।

বড় বাবু জিজ্ঞেস করলেন—নিয়ামতের বাড়ী চুরি হয়েছে, এ-সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?

—না বাবা, আমি আজ ক'দিন বিছেন থেকে উঠতে পারিনি। আপনার ডাকে কষ্ট করে উঠে এলাম, নইলে কি উঠতাম!

—কিছু জানো না?

—না।

—তোমার বাড়ী তো ঐ দেখা যাচ্ছে, এতোটুকু পথ মাত্র; কোন সাড়া-শব্দ পাওনি?

—সারা রাত লেপ মুড়ি দিয়ে ছট্‌ফট্‌ করেছি, বাইরে কোথায় কি হয়েছে, তা' আমি জানিনে।

বড় বাবু জুড়নকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কিছু জানো?

—না।

—তা'হলে তোমরা দু' ভাইয়ে কেউ কিছু জানো না?

—না।

—চলো, তোমাদের বাড়ী যাব।

বড় বাবু সিপাইদের ইঙ্গিত করলেন। তারা দু'জনকে নিয়ে আগে আগে চললো। বড় বাবু মিয়া সাহেবকে সাথে নিয়ে পিছনে পিছনে কি যেন বলা-বলি করতে করতে গেলেন।

গোলার নীচে দাঁড়িয়ে বড় বাবু জিজ্ঞেস করলেন—এখানে ধান পড়ে রয়েছে কেন? সরদার বল্‌লো—কালকে ধান ভিজিয়েছিল, তাই পাড়বার সময় পড়ে গেছে।

—পাড়বার সময় পড়েছে, না রাতে তুলবার সময় পড়েছে?

—রাতে ধান তুল্‌তে যাব, তা' পাব কোথায়?

—কতটা ধান হয়েছিল এবার?

—যা' হয়েছিল, সব গোলায় আছে, স্যার।

—গোলার বাইরে থেকে দেখিয়ে দাও—কত পর্যন্ত তোমার ধান আছে?

—বাইরে থেকে কি করে বল্‌বো?

—বাহ্! তোমার ধান গোলায় তুলেছ, গোলার কোন্ পর্য্যন্ত হয়েছে, তা' বল্‌তে পারবে না?

সরদার চুপ করে রইল। গোলার কোন্ পর্য্যন্ত যে তার ধান হয়েছিল, তা' তার জানা আছে, তবে কাল রাতের চুরি করা ধান তুলে যে গোলার কত দূর উঠেছে, তা' জানে না; কেননা, ধান তুলবার সময় কিচমত গোলার মধ্যে ছিল।

তাকে চুপ্‌ করে থাকতে দেখে বড় বাবু ধমক দিলেন।

—কি হল, দেখাচ্ছো না কেন?

সরদার আন্দাজে দেখিয়ে দিল—'এই পর্য্যন্ত ধান আছে।'

দারোগা সাহেবের ইঙ্গিতে সিপাই গোলার দোরে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে বললো—ওর চেয়ে বেশী ধান আছে স্যার!

—কি ব্যাপার সরদার সাহেব, ধান যে বেশী।

—তা একেবারে ঠিক্‌ ঠিক্‌ বলা যায়! বেশী-কম তো হবেই।

—তা'হলে চোরাই ধান এ গোলায় উঠেনি তো?

—আপনি বলছেন কি স্যার! আমার কি টাকা-পয়সার অভাব হয়েছে যে চুরি করবো!

—বেশ ভাল কথা। এই সিপাই! যাও তো—ঘর, রান্না-ঘর সব দেখে এসো।

একজন সিপাই রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো—রান্না-ঘরের মেঝের মাটি খোড়া মনে হচ্ছে।

বড়বাবু সেখানে যেয়ে মাটি খুড়ে ফেলতে বললেন, সিপাইরা মাটি খুড়ে ফেললো। তার মধ্যে অনেক চোরাই জিনিস-পত্র এবং টাকা-পয়সা পাওয়া গেল।

দারোগা সাহেব বললেন—কি ব্যাপার সরদার সাহেব, এসব কি?

সরদার কোন কথা বললো না।

—কথা বলছো না কেন, আর কোথায় কি আছে—বের করে দাও!

—আর কিছু নেই।

—গোলার ধান?

—ধান সব আমার।

বড় বাবু মিয়া সাহেবকে ডেকে নিয়ে তফাৎ যেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এখন কি করতে বলেন।

মিয়া সাহেব বললেন—নিয়ামত গরীব মানুষ, এখন মাল-পত্র সব যদি ছিচ করে নেন, তা'হলে ও মরে যাবে।

—চোর মরবে না। এক কাজ করুন, অনুমান মত কিছু ধান আর জিনিস-পত্রের মধ্যে যেগুলো সচরাচর দরকার, সেগুলো নিয়ামতকে দিয়ে বাকীগুলো চোরাই মাল বলে লিখে নিন।

মিয়া সাহেবের কথামত দারোগা সাহেব লোক দিয়ে গোলার অর্ধেক ধান পেড়ে নিয়ামতকে দিয়ে দিলেন। আর বাকী ধান গোলায় রেখে তালা লাগিয়ে চাবি পকেটে রাখলেন। জিনিস-পত্রের মধ্যে থালা-বাটা-ঘটি, হাড়ি-কড়াই বিছেন-কাঁথা এবং কিছু টাকা নিয়ামতকে দিয়ে বাকীগুলো চোরাই মাল বলে কেস লিখলেন। অবশ্য—এটা আইনসঙ্গত নয়, তবে দারোগা সাহেব মিয়া সাহেবের কথাও ফেলতে পারলেন না! এ-অঞ্চলে তিনিই একমাত্র মানুষ, যিনি স্বাধীনতার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাই তার সম্মান রেখে দারোগা সাহেব আসামী সহ থানার দিকে চললেন। যাবার বেলায় বুড়ো সরদার মিয়া সাহেবকে ডেকে বললেন—তোমার বাপ

আমাকে অনেকবার সৎপথে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি কোন দিন তাকে গ্রাহ্য করিনি; এবং তাকে অগ্রাহ্য করে গ্রামের অনেক লোককে ফাঁকি দিয়ে আমি অনেক জমি-ক্ষেত, টাকা পয়সা করে নিয়েছি। তোমার বাপ যখন মরে গেল, তখন মনে মনে স্থির করেছিলাম—মিয়া সাহেবদের সব কিছু ধ্বংস করে ফেলবো। তুমি ছোট ছিলে, তুমি জানো না; গ্রামের কত লোককে সম্পত্তি-হারা করেছি। মনে করেছিলাম—তোমার বাপ যখন পারলো না, তখন তুমি আর কি করতে পারবে। তোমার বাপ বেঁচে থাকতে কোন একটা অন্যায় করেছিলাম, অবশ্য কেউ জানতো না। কিন্তু কেমন করে নিয়ামতের বাপ জেনে ফেলেছিল। ওর বাপ মিয়া সাহেবকে জানিয়ে দিল সব। তখন মিয়া সাহেব আমাকে ডেকে এনে অনেক লোকের সামনে খুব করে মারে। সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে কোন প্রকারে নিয়ামতদের দু'ভাইকে আর তোমাকে পথে বসাবো। আসমতকে বোকা বানিয়ে ফেলেছিলাম, নিয়ামতকে তো পথে বসিয়েছিলাম; কিন্তু ভাগ্য খারাপ, তাই পারলাম না। তোমার বাপের চোখে ফাঁকি দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার চোখে ফাঁকি দিতে পারলাম না। তোমাকে যত সহজ মনে করেছিলাম, তুমি তার চেয়েও কঠিন। তোমাকে আগে বুঝতে পারলে আজ আর বুড়ো বয়সে জেলে যেতে হত না। তোমাকে চিনলাম সত্যি, কিন্তু পথ আর নেই।

দারোগা সাহেব মিয়া সাহেবের হাতে হাত মিলিয়ে সালাম জানালেন। তার পর থানার দিকে পা বাড়ালেন। সিপাইরা আসামীদের গাজায় দড়ি বেঁধে দারোগা সাহেবের পিছে পিছে চললো!

ও-দিকে তখন আমির সরদারের বাড়ীতে কান্নার রোল উঠলো। 'যেমন কর্ম তেমন ফল, আর কেঁদে কি হবে'—বলে উপস্থিত গ্রামবাসীরা যার সেই বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো…।

~~পূর্ব-পাকিস্তানের~~ বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের
ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কারের এবং সরকারী-বেসরকারী
পাঠাগারের রক্ষণ উপযোগী মূল্যবান
(চরিতমালা সিরিজ) জীবনী-গ্রন্থ।

ঃ বিপ্লবী নেতাদের জীবনী-গ্রন্থ ঃ

(চরিতমালা সিরিজ)

O	ছোটদের প্রিয় কায়েদে আজম	২'৫০
O	ছোটদের প্রিয় লিয়াকত আলী	২'৫০
O	ছোটদের প্রিয় শহীদ সোহরাওয়ার্দী	২'৫০
O	ছোটদের প্রিয় শেরে বাংলা	২'৫০
O	ছোটদের প্রিয় ইকবাল	২'৫০
O	ছোটদের প্রিয় নজরুল	২'৫০
O	ছোটদের প্রিয় রবীন্দ্রনাথ	২'৫০
O	ছোটদের প্রিয় মহাত্মা গান্ধী	২'৫০
O	ছোটদের প্রিয় জওয়াহেরলাল নেহরু	২'৫০
O	ছোটদের প্রিয় হাসেম আলী খান	'৭৫

ঃ রূপকাহিনী ঃ

O	দাদাজানের আসর (দরবারিয়া গল্প)	৩'৫০
O	দৈত্যরাজের গুপ্তকথা	২'৫০
O	আরব্য উপন্যাস	৩'৫০
O	ঠাকুরমার ঝুলি	২'৫০
O	গোপালভাড়ের কেচ্ছা	২'০০

বিনীত ম্যানেজার—

কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী,

ব রি শা ল।